একক ৪ □ বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্য

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ মূল আলোচনা

৪.৩ অনুশীলনী

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের উদ্ভবের পটভূমি ও সুফীধর্মের সঙ্গে তার যোগ আবিষ্কার করতে পারবেন। হিন্দী-অওধী ও ফারসী ভাষায় লেখা অন্যান্য প্রণয়কাব্য কীভাবে বাঙালি কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে জানতে পারবেন। রোমান্স প্রণয় কাব্যের প্রথম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তি পরিচয় সম্ভবন্ধে জানা সম্ভভব হবে। সগীরের কাব্য ইউসুফ জোলেখার কাহিনী, প্রেমভাবনা, কবিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্ ধারণা করতে পারবেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিস্রোত হল মুসলমান কবি রচিত বাংলা রোমান্স প্রণয়কাব্যের ধারা। এ ধারায় রচিত সাহিত্য পূর্বাগত সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার বর্জন করে নির্ভেজাল মানুষকেই তার উপজীব্য করে তুললো। এতদিন বাঙালি হিন্দু কবিরা যা কিছু লিখে আসছিলেন তার সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবে মিশে ছিল নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলির অনুষঙ্গ। কিন্তু সেই ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে একপাশে সরিয়ে রেখে কেবল মানবাশ্রিত কাব্য রচনার নজির গড়তে পারলেন মুসলিম কবিরা। এর পিছনে ইসলামের ভূমিচারী দৃষ্টির ও সুফীধর্মের আত্যন্তিক মানবপ্রীতির সদর্থক ভূমিকা ছিল। এটা তথ্যসমর্থিত ঘঠনা যে, শৈক্ষিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দু কবিরা মুসলমান কবিদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও তাঁদের লেখাতে মানুষেরা সামাজিক ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞান তেমন স্পষ্টতা পায়নি। মনসামঙ্গলে চাঁদ পৌরুষের বলে দৈব-প্রতিকূলতার বিরুধ্বে লড়াই করেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বামহাতে পূজা দিয়ে দৈবীমাহাত্ম্যেরই জয় ঘোষণা করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যটি ছিল গভীরতর অর্থে মানবজীবনের ইতিকথা, কিন্তু তাঁকেও যুগধর্মের নীতিনিয়ম মেনে স্বীকার করে নিতে হয় ধর্মের বর্ম। রক্তে-মাংসে গড়া ক্ষুধা-তৃষ্মাযুক্ত বাস্তব সংসারের মানুষ ছিলেন শচীদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁকও কি সময়ের আবেষ্টনী থেকে বের করে আনা সম্ভভব হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সেকালে লেখা সমস্ত চৈতন্যজীবনীতে বর্ণাশ্রমধর্মের যুগাযুগান্তব্যাপী গভীরতল সঞ্চারী শিকড়কে উপড়ে ফেলার দরুন তিনি সকল শুভবুধ্বিসম্পন্ন মানুষের কাছে পরিগণিত হন ত্রাতা বলে। যুগের আবহ সেই সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা মানুষটিকে শাস্ত্রবচনের সঙ্গে মিলিয়ে কৃষ্মের অবতার বলে নির্দেশ করেছে। অথচ এইসব সাহিত্য-প্রতীতির পাশাপাশি মুসলমান কবিদের রচিত প্রণয় আখ্যানধর্মী কাব্যের আত্মিক তফাৎ কত দুস্তর। তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মানুষকে দিলেন মুক্তি—সেই মানুষ যে দেহ ও মনের ক্ষুধায় কাতর, যার আছে প্রবৃত্তি, আসক্তি, বিবেক, নৈতিকতা, দয়া, ক্ষমা, লোভ, মোহ, যার কাছে প্রেম-মিলন-বিরহ কোন তত্ত্বের বিষয় নয়, জীবনের জ্বলন্ত বাস্তব। মনে রাখা প্রয়োজন হিন্দুধর্মের মতো ইসলাম ধর্মও প্রতিষ্ঠান নর্ভির, সেখানেও নানাবিধ কৃত্য, সংস্কার ও শাস্ত্রবিধি আছে। কিন্তু সে ধর্মের অনুশাসনে

মানুষের ভৌমচেতনা বেশ স্পষ্ট। ধর্ম প্রবক্তা হজরত মহম্মদ কোথাও দাবি করেননি যে তিনি ঈশ্বরকল্প কোন সত্তা, বরং তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা : 'আনা বাশারুম মিসলুকুম্'—অর্থাৎ আমি তোমার মতই একজন মানুষ। হয়তো এ পথ ধরেই মুসলমান কবিদের হাতে সাহিত্যে মানবতাবাদের সঞ্চার ঘটেছিল। তবে তার পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে, যাকে আশ্রয় করে এইসব কবিরা রোমান্স কাব্য সাধনায় স্বতন্ত্র একটি ধারার জন্ম দিয়েছিলেন সেই মরমীয়া সূফীবাদ ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল। সূফীধর্ম নৈষ্ঠিক ইসলামেরই একটি শাখা, যাঁরা শরীয়তের বিধানকে শেষ গন্তব্য হিসেবে না দেখে মারিফতের মাধ্যমে আল্লাহের নৈকট্য লাভ করতে ও আত্মলীন হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেমময়। তাঁর প্রেম ও করুণা লাভ করাই সাধকজীবনের লক্ষ্য। আল্লাহের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীব মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক মার্গের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে আরব-ইরানে রোমান্স কাব্যধারা গড়ে ওঠে। সেই অর্থে মানবমানবীর প্রেমকাহিনী ছিল সূফী কবিদের কাছে রূপক। জালালুদ্দিন রুমী, আবদুর রহমান জামী, ফেরদৌসী প্রমুখ সূফী কবিগণ রাজা-বাদশাহ-আমীর-বণিক প্রভৃতি শাসক ও বণিক শ্রেণীর প্রচলিত প্রেমকাহিনীকে আধ্যাত্মিক প্রেমকাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। অনেকের ধারণা, সামন্ত সমাজব্যবস্থায় ধার্মিকতার ও নৈতিকতার সাথে আপোষ করতে কবিদের এ পথ বেছে নিতে হয়েছিল। যাইহোক, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সুফীদের আগমন ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তাঁদের মারফত বাংলাদেশে এইসব প্রণয়বৃত্তান্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি মুসলমান কবিরা স্বসংস্কৃতির রসে নিজেদের মনের শিকড় ভিজিয়ে নেওয়ার তাগিদে আরবী ও ফারসীতে লেখা এইসব কিস্‌সার শরণাপন্ন হন। তবে তাঁদের কাব্যে এর ধর্মীয় বাতাবরণ ও তাত্ত্বিক নির্গলিতার্থটি যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁরা খাঁটি মানুষকেই তার যাবতীয় ত্রুটি ও অম্পূর্ণতাসহ সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। সাহিত্যের উপজীব্য যে মানুষ এবং ভক্তিরস ছাড়া সাহিত্য যে বিশুদ্ধ জীবনরসের উপর নির্ভর করতে পারে এই ধারণায় মধ্যযুগের বাঙালি পাঠককে দাঁড় করাতে সমর্থ হল এই বিশেষ কাব্যধারা। এ ধারার প্রথম সূচনাকার বলে যাঁকে দাবি করা হয়েছে তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।

বাংলা রোমান্স প্রণয়-কাব্যের ধারাটি অনুবাদ শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ এতে ব্যবহৃত কাহিনীগুলি কবিদের নিজস্ব উদ্ভাবনা ছিল না, এদের উৎস লুকিয়ে ছিল অন্যত্র। সমালোচকেরা ভাষা, চরিত্র ও কাহিনী পটভূমির প্রেক্ষিতে সেই উৎসকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হিন্দী-অওধীতে লেখা ভারতীয় প্রেমকাব্যের ধারা, অন্যটি আরবী-ফারসীতে লেখা আরবীয়-ইরানীয় প্রণায়োপাখ্যানের ধারা। তবে এই দুই ধারাতেই লেখক হিসেবে যাঁদের পাই তাঁরা ধর্মে মুসলমান এবং কম-বেশি সূফীতত্ত্বের দ্বারা প্রাবিত। দ্বাদশ শতক থেকে হিন্দী অওধীতে যে রোমাণ্টিক প্রণয়-আখ্যান চলে আসছে তার প্রমাণ মেলে আবদুর রহমানের সংনেহয় রাসয়, চান্দ বরদাইয়ের পৃথ্বিরাজ রাসউ, আমীর খসরুর খিজির খান ও দেবলরানী, মুল্লা দাউদের চান্দায়ন, মিঞা সাধনের মৈনাসৎ, জায়সীর পদুমাবৎ প্রভৃতি কাব্য থেকে। ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে মুখ্যত হিন্দু চরিত্রের আশ্রয়ে মুসলমান কবিরা এ ধরনের ১৪/১৫টি বিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সমানভাবে ফারসীতে লেখা হয়েছে ইউসুফ-ওয়া-জোলায়খা, লায়লীমজনু, খসরু-শিরীন, সয়ফলমুলুক-বদিউজ্জমাল, হফ্‌ত পয়কর, সলমন-অবসাল, হানিফা-কয়রাপরী, জেল্লমুলুক-শামারোখ প্রভৃতি বই। বলা হয়ে থাকে যে, এগার শতকের কবি ফেরদৌসী ইউসুফ-ওয়া-জোলায়খা কাব্য রচনা করে এ শ্রেণীর কাব্যের দ্বার উন্মোচন করেন। যদিও সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পনের শতকের কবি আবদুর রহমান জামী। এই গ্রন্থটিরই বাংলা অনুবাদ করেন শাহ মুহম্মদ সগীর। সগীরের কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা' ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ মানবপ্রেমের রোমান্টিক আখ্যান। তাঁর এ পথেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিলেন মুহম্মদ

কবীর, শা বিরিদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খা, দৌলত কাজি, সৈয়দ আলাওল, আবদুল হাকিম, নওয়াজিশ খান, মুহম্মদ মুকীম, শেখ সাদীর মতো খ্যাত-অখ্যাত কবিরা।

৪.২ মূল আলোচনা

মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কবির মতো শাহ মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যে কোন সাল-তারিখের উল্লেখ করেননি। তার পরিবর্তে 'রাজ্যক ঈশ্বর' পৃথিবীর সার কোন এক 'মহা নরপতি গ্যেছ'-র কথা বলেছেন, তিনি 'রাজ-রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত। দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত।। মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।' বলা বাহুল্য 'গ্যেছ' গিয়াসউদ্দনের সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপ। এখন মুশকিল এই যে, মধ্যযুগে বাংলার শাহীতক্তে সূরবংশীয় একাধিক গিয়াসুদ্দিনকে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। 'বাংলাসাহিত্যের কথা' গ্রন্থে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন যে, বাংলার মসনদে একই নামধারী তিনজন সুলতান রাজত্ব করেছেন। যথা—গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫-৬০), গিয়াসুদ্দিন জালাল শাহ (১৫৬০-৬৩) এবং তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন (১৫৬৩-৬৪)। এঁরা ব্যতীত আর একজন গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ রাজত্ব করেছেন ১৩৮৯-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যে। অধিকাংশ গবেষক এই শেষোক্ত সুলতানের রাজত্বকালে মুহম্মদ সগীরের আবির্ভাবকাল বলে নির্দেশ করেছেন। কেননা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার বাইরে এই ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, গুণীর পৃষ্টপোষক, ধার্মিক এবং সজ্জন—যে তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কবির বর্ণনা। তাছাড়া সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এই সুলতানের গুণকীর্তন করেছিলেন পারস্যের কবি হাফিজ ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। এইসব যুক্তির অবতারণা করে শহীদুল্লাহ কাল-পরম্পরায় সগীরের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—'মধ্যযুগের আদি লেখক বড়ু চণ্ডীদাস, তৎপরে শাহ মুহম্মদ সগীর এবং তৃতীয় লেখক কৃত্তিবাস।' বলিষ্ঠ বিরোধী তথ্য পাওয়ার আগে পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তকে মানতে বোধহয় বাধা নেই।

সগীরের কাব্যের নাম 'ইউসুফ-জোলেখা'। তিনি এর কাহিনীটি কোথা থেকে পেয়েছিলেন এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে ধন্দ আছে। অনেকের মতে, কাব্যটির উৎসে ছিল 'শাহনামা'-র রচয়িতা ফেরদৌসী তূসীর (৯৩৭-১০২০ খ্রি.) লেখা ফারসী কাব্য 'ইউসুফ-জোলেয়খা', যেটি একাদশ শতকের রচনা। এই গ্রন্থের আর একটি আদর্শের কথাও বলেছেন কেউ কেউ। সেটি হল আবদুর রহমান জামীর লেখা 'ইউসুফ-ওয়া-জোলয়খা', যার রচনাকাল ১৪৮৩ খিষ্টাব্দ। কিন্তু এই মতটিকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে যে, সগীর এ কাব্য গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) লিখে ফেলেছিলেন। এছাড়া কবি নিজে আর একটি উৎসের কথা জানিয়েছেন তাঁর কাব্যের সূচনায় এবং আমাদের মনে হয় সেটাই পূর্বোক্ত দুইজন আরবীয় কবিরও কাব্য-উৎস। উৎসটি হল পবিত্র কোরাণ শরীফ। ঐ ধর্মগ্রন্থের 'সূরা ইউসুফ' অধ্যায়ে মোট ১১১টি আয়াতে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মোপদেশ দান। ধার্মিক এবং চরিত্রবান ব্যক্তিরা আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হন—এইরকম একটা নীতিকথা বেরিয়ে আসে কোরানে বর্ণিত আখ্যান থেকে। সগীরও ভক্তজনের 'শ্রুতি-ঘট' পরিপূরণের জন্য সেই কাহিনীকেই আশ্রয় করেছেন। কবির স্বীকারোক্তি—'কিতাব কোরাণ মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ। ইউসুফ জলিখা কথা অমৃত অশেষ।। কহিব কেতাব চাহি সুধারস পূরি।' ড. ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থে সগীরের কাব্যাদর্শ প্রসঙ্গে আর একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন, সেটি কোরানের তফসীল বা ব্যাখ্যাপুস্তক, যার লেখক ইমাম গজ্জালী। এতে

দেখা যায়, জোলেখা পশ্চিমদেশের রাজা তাউমুসের কন্যা ছিলেন। কবিও কাব্যমধ্যে সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া আরেও অনেক প্রসঙ্গের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তফসীরের তুলনায় সগীরের বর্ণনা বর্ণাঢ্য, পল্লবিত, নাটকীয়, পারস্পর্যযুক্ত ও আবেগমধুর। আরো একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস্ অংশে যোসেফের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গেও কাঠামোগত মিল আছে কোরানের ইউসুফ কাহিনীর। এবং এখানেই শেষ নয়। কবি সগীর নিজে তাঁর প্রয়োজন মতো বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত গল্পের খণ্ডাংশগুলি সংযুক্ত করে নিয়েছিলেন ও একটি আস্ত স্বকপোলকল্পিত কাহিনী গল্পের শেষাংশে জুড়ে দিয়েছিলেন। সেটি হল ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ শাহাবালের কন্যা বিধুপ্রভার প্রণয়বত্তান্ত। মুসলমানী আখ্যানে হঠাৎ হিন্দু চরিত্রের আমদানি কেন, এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। তার মীমাংসা খোঁজা যায় ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে—'এই বর্ণনাতে বুঝা যাইতেছে, ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান কবি পূর্বতন হিন্দু সংস্কার ভুলিতে পারেন নাই।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-৩য় খণ্ড)।

মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য শুরু করেছেন আল্লাহ ও রসুলের বন্দনা দিয়ে। অতঃপর আছে মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রশংসা এবং রাজস্তুতি। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের দরবারের কর্মচারী ছিলেন। নইলে তাঁর রাজস্তুতি অত প্রগাঢ় হতো না। আখ্যানের সূচনায় আছে তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখার জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি এবং স্বপ্নদর্শনে এক রূপবান পুরুষের প্রতি রূপাসক্তি। কিন্তু জোলেখার সঙ্গে ভুলক্রমে আজিজ-মিশরের বিবাহ হয় এবং আজিজ সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ নয় জেনে জোলেখা হতাশ হয়ে পড়েন। এরপরে কোরান ও ফেরদৌসীর বর্ণনানুসারে ইউসুফের জন্ম ভ্রাতৃদ্রোহ বিড়ম্বনার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে। এক বণিক তাঁকে উদ্ধার করে। তাঁর নাম মনিরু। পরে তিনি তামার মুদ্রার বিনিময়ে ইউসুফকে বিক্রি করে দেন। নীল নদীর জলে ইউসুফ স্নান করলে তাঁর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় এবং অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দলে দলে লোক ভীড় করে। জোলেখা এই অপূর্ব রূপবান ইউসুফকে দেখ মূর্ছা যান এবং পরে নিজ ধনরত্ন দিয়ে ইউসুফকে কিনে নিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। পরের ঘটনা বর্ণনায় তফসীবের অনুসরণ করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সগীর উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, বৃদ্ধা জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তাঁর ঘটনাপূর্ণ বিবাহ ও বাসর যাপনের বর্ণনা। ফারসী কাব্যের আখ্যানভাগে ইউসুফ-জোলেখার মিলন ও পরিশেষে মৃত্যু দেখানো হয়েছিল। কিন্তু সগীরের কাব্যে ইউসুফের ভাই ইবিন আমিনের সঙ্গে মধুপুরের রাজদুহিতা বিধুপ্রভার পরিণয়কে কেন্দ্র করে কাহিনী পল্লবিত ও প্রলম্বিত হয়েছে। এই অংশটি একেবারে কবির নিজস্ব কল্পনা। দ্বিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ইউসুফ একটি অদ্ভুত জন্তুর পিছনে অশ্ব চালিয়ে একা বিজন বনে এসে পড়েন। বনের এক সরোবরের পাড়ে সুরম্য পুরীর মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বিধুপ্রভার পিতা শাহাবাল গন্ধর্বদের রাজা। বিধুপ্রভা স্বপ্নদৃষ্ট এক নবীপুত্রের প্রতি তাঁর প্রণয়াসক্তির কথা বললেন। ইউসুফ স্বপ্নতত্ত্বভেদ করে জানালেন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিটি তাঁর ভাই ইবিন আমিন। অতঃপর বিধুপ্রভার পালিত ও সুশিক্ষিত শুকপাখীকে দূত করে পাঠানো হয় এবং ইউসুফ ভ্রাতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেন। শুকের কাছে গন্ধর্বরাজকন্যার কথা শুনে আমিন প্রেমবেদনা অনুভব করলেন এবং গন্ধর্ব মহামন্ত্রে খগচর বা পাখির রূপ নিয়ে রাজকন্যার কাছে এলেন। বিধুপ্রভা স্বয়ংবর সভার আয়োজন হল। বিধুপ্রভার বরমাল্য আমিনকে অর্পণ করলেন। গন্ধর্বরাজ শাহাবাল তাঁর রাজ্যে রাজপদে জামাতা আমিনকে অভিষিক্ত করলেন। ভাইকে মধুপুরে রেখে ইউসুফ ফিরে এলেন মিশরে। ইবিন স্বজনবিরহে পীড়িত হলে স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে বিধুপ্রভা মিশরে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁরা যথাসময়ে মিশরে উপস্থিত হলে আনন্দের রোল পড়ে গেল।

শাহ মুহম্মদ সগীর মূলত মানবীয় প্রেমোপাখ্যানের কবি। কাব্যটিতে যে প্রেমের কিস্‌সা অনুসরণ করা হয়েছে তার প্রকৃতি রূপজ, মোহজ। জোলেখার ভালোবাসা সম্পূর্ণ দেহগত। স্বামীর নপুংসকত্ব তার অতৃপ্ত জৈবিক কামনাবহ্নিকে শত শিখায় উদ্দীপ্ত করেছে। হৃদয়ের অপরিসীম জ্বালা নিয়ে সে প্রণয়াস্পদকে কামনা করে। সমাজ সংসার ধনসম্পদ, ইহলোক-পরলোক, পাপ-পুণ্য সব কিছু তুচ্ছ করে সে এক কূলপ্লাবিত নদীর মতো সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে। জোলেখার প্রেমের তিনটি স্তর অতি স্পষ্ট। সে প্রথমে রূপ দেখে শিহরিত হয়, মুর্ছা যায়। পরে কামোন্মত্ত হয়ে পড়ে। সবশেষে প্রেমসাগরে সব কিছু ভুলে ভেসে যায়। তবে জোলেখা কলঙ্কিনী হলেও কলুষিতা নয়। সে কামোন্মত্তা হলে অন্য উপায়ে ভোগবাসনা নিবৃত্ত করতে পারতো। রূপতৃষ্ণা তার কামবোধের ইন্ধন যুগিয়েছে সত্য, তবে তার আত্মরতি একমুখী হয়েছে। যৌবন অপগত হলেও জোলেখা প্রেমাস্পদকে এক পলক দেখার জন্য রাজপথের পাশে অসীম প্রতীক্ষায় প্রহর গুণেছে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও জোলেখা কিসের সাধনা করে? সে কি কামের? না, এ চিরঞ্জীব শাশ্বত প্রেম। যখন তার কাম ব্যর্থ হয় তখন প্রেমিকাকে কারাগারে পাঠিয়ে প্রতিশোধ নেয়, কিন্তু যখন প্রেম ব্যর্থ হয় তখন জোলেখার মনে আত্মক্ষোভ জাগে। কবি জোলেখাকে রক্তমাংসের এক বাস্তব চরিত্র করে এঁকেছেন। অন্যদিকে ইউসুফ চরিত্রকে নীতিধর্মের শুষ্ক কাষ্ঠপুত্তলিকা বলে মনে হয়। সংযমশীলতায় তিনি একজন আদর্শবাদী পুরুষ। তাঁর হৃদয়ে প্রেমের কোন আসক্তি নেই, নেই কোন দ্বন্দ্বও। জোলেখার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইউসুফের অবস্থান।

কবি কি তাঁর কাব্যে কোথাও ধর্মের কোন অনুষঙ্গ রাখেননি? কাব্যটির সূচনাংশে 'পোথার কথন' পড়লে প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন একটা জবাব পাওয়া যায়। কবি প্রেমের আখ্যান বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন 'ধর্মবাণী' প্রকাশের কারণে। তাঁর পূর্ববর্তী ইরানীয় কবিরা এ কাহিনীকে দেখেছিলেন ধর্মতত্ত্বের আলোয়। তাঁরা ইউসুফকে মাশুক তথা পরমাত্মা ও জোলেখাকে আশিক তথা জীবাত্মা হিসেবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। ইউসুফের রূপের প্রতি জোলেখার আসক্তি এই দৃষ্টিতে হয়ে দাঁড়ায় আশিক-মাসুকের মিলনকামনা। ইন্দ্রিয় সম্ভোগ বাসনার দ্বারা যে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না, অন্তরের প্রেম দ্বারা তাঁকে পেতে হয়—এমন একটা গভীর দার্শনিক কথাও এই গল্পটির রূপকে বর্ণিত। সগীর এ তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কেননা তাঁর সূফীবাদে বিশ্বাস ছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। 'শাহ' উপাধিটি পীরের প্রতিনিধিত্বের দ্যোতক। যাইহোক, সগীর সূফী ধর্মাদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে এ কাব্য রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ তিনি নিজেই করেছেন। লিখেছেন—'শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন। রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।।...ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা। ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা। ভাবক-ভাবিনী অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মা। এই স্বীকারোক্তির পর এ কাহিনী যে ধর্মীয় প্রেমোপাখ্যান তা নিয়ে আর কোন সংশয় থাকে না।

রোমান্স কাব্যের বৈশিষ্ট রচনাটির মধ্যে সগীর যথাযথভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রণয় আখ্যানের কবিদের লক্ষ্য ছিল গল্পের ঘনঘটায় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা। সগীরও সেই পথেৰ অনুগামী। গল্পরচনা কবির লক্ষ্য ছিল বলে ঘটনার গ্রহণ-বর্জনের কোন হিসেব করেননি। কোরান ও অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত ঘটনায় মৌলিকতা না থাকলেও একটা গতি লক্ষিত হয়। পাঠককে গল্প শোনানোর নেশায় তিনি ইবিন আমিন-বিধুপ্রভা প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। অনেক সমালোচকের মতে, এতে বাইবেলের ও কোরানের গল্পের ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে। তবে তাতে যে রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথা মানা যায় না। রোমান্স কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হল অলৌকিক উপাদানের বাহুল্য। কেননা এ ধরনের কাব্যে imagination এর তুলনায় fantasy-র প্রাধান্য বেশি। এখানেও স্বপ্ন, আকাশ-বাণী, অবলা শিশুর মুখে বাক্‌ক্ষমতা, মূক পশুর মুখে মানববাণীর প্রয়োগ আছে। সমস্ত কাব্যটিতে স্বপ্নের যেন বন্যা বয়ে গেছে।

স্বপ্ন দেখেছেন ইউসুফ, জোলেখা, বণিক, মিশররাজ, ইবিন আমিন, বিধুপ্রভা। জোলেখার স্বপ্ন তার জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত বলে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার যৌবনের ভোগাকাঙ্ক্ষাই স্বপ্নের মধ্যে রূপময় হয়ে উঠেছে। কাব্যের মধ্যে রয়েছে ছয়-সাতটি দৈববাণীও। এতে কাহিনীর বাস্তব রস তরল হলেও কবির রোমান্সসুলভ খেয়ালী কল্পনা ডানা মেলে ওড়বার সুযোগ পেয়েছে। বিধুপ্রভার সমগ্র আখ্যানটি রূপকথাধর্মী। তার শুক মন্ত্রসিদ্ধ পাখি। শুকের মন্ত্রগুণে আমিন খগচরে রূপান্তরিত হয়ে মধুপুর রাজ্যে গমন করে। এতেও বাস্তবের লেশমাত্র নেই। রয়েছে বারমাস্যা গীতও। ইউসুফের প্রতি জোলেখার প্রেমের আর্তির প্রকাশে বারমাস্যার করুণরস নিঃসৃত হয়েছে। সর্বোপরি কাম ও প্রেমের রূপচিত্রণে সগীরের কৃতিত্ব স্বীকার্য। তাঁর বর্ণিত প্রেম বাস্তবতার উর্ধে উঠে কোনো অলৌকিক ব্যঞ্জনায় ঠুন্‌কো হয়ে পড়েনি। প্রেমের মাহাত্ম্যও ঐ বাস্তবতার মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

অনুবাদক কবি হিসেবে মুহম্মদ সগীরের আরো একটি মনোভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু কবিরা শাস্ত্রকথাকে সংস্কৃতির বন্ধনমুক্ত করতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে যে দ্বিধায় পড়েছিলেন, বোধহয় মুসলিম কবিদের ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু ঘটে থাকবে। তিনি গোঁড়া মুসলিমদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবাণীতে লিখতে খুবই উৎসাহী ছিলেন। স্বভাষার প্রতি এই যে মমতা তিনি বাংলা সাহিত্যের আদি মুসলমান কবি হিসেবে দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই স্মরণীয় ও গর্বের বিষয়। কবি লিখছেন,—'না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়। দূষিব সকল তাক ইহা না জুয়ায়। গুণিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহা ভয় মিছা। না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।।' কাব্যকলার নিরিখে শাহ মুহম্মদ সগীর কেবল একজন মরমী কবি বলেই বিবেচিত হন না, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সীমাহীন দরদে একজন উচু দরের দেশপ্রেমিক বলেও তাঁকে গণ্য করা যায়।

সবশেষে উল্লেখ থাকে যে, মুহম্মদ সগীর ছাড়া ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের আরো পাঁচজন অনুবাদক কবি ছিলেন। এঁরা হলেন আবদুল হাকিম, ফকীর গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদের আলী ও ফকির মহম্মদ। এঁদের মধ্যে আবদুল হাকিম ও গরীবুল্লাহের রচনা কিছু উৎকৃষ্ট। কিন্তু এঁরা আমাদের আলোচ্য সময়সীমার বাইরে বলে এঁদের কাব্য সম্বন্ধে আপাতত নীরব থাকা গেল॥

৪.৩ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বাংলা রোমান্স প্রণয় কাব্য রচনার পটভূমিটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৩। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের মধ্যে রোমান্স কাব্যের বৈশিষ্ট্য কতখানি রক্ষিত তা উদাহরণযোগে দেখিয়ে দিন।

৪। অনুবাদক হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের মূল্যায়ন করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। আরব-ইরানের রোমান্স কাব্যধারার সঙ্গে বাংলা রোমান্স কাব্যের সংযোগ কোন্‌খানে?

২। হিন্দী-অওধী ও ফারসীতে লেখা রোমান্স কাব্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। শাহ মুহম্মদ সগীরের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫। ইউসুফ-জোলেখায় কি কোন ধর্মের অনুষঙ্গ আছে?

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। রোমান্স কাব্যধারা প্রথম কোথায় গড়ে ওঠে?

২। রোমান্স কাব্যধারার সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় কি?

৩। শাহ মুহম্মদ সগীর কোন্ প্রশাসকের সময়ে আবির্ভূত হন?

৪। ইউসুফ-জোলেখার উৎস কি?

৫। ভাবক-ভাবিনী বলতে কি বোঝায়?

৬। সগীর ব্যতীত আর ক'জন কবি ইউসুফ-জোলেখা কাব্য অনুবাদ করেন?

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ১৯৭৫

২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ১৯৮৭

৩. আবদুল হাফিজ, বাংলা রোমান্স কাব্য-পরিচয়, ১৩৮৭

৪. আজহার ইসলাম, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, ১৩৯৯

একক ৫ □ প্রাক্-চৈতন্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ রামায়ণের অনুবাদের ধারা

- ৫.২.১ কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল
- ৫.২.২ অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব
- ৫.২.৩ কাহিনী-গ্রন্থনে মৌলিকতা
- ৫.২.৪ চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনবত্ব
- ৫.২.৫ রসসৃজনে দক্ষতা
- ৫.২.৬ কাব্যনির্মিতি কৌশলে বিশিষ্টতা
- ৫.২.৭ ভক্তিবাদ প্রচারে সফলতা
- ৫.২.৮ বাঙালিয়ানা প্রকাশে অনবদ্যতা

৫.৩ ভাগবত অনুবাদের ধারা

- ৫.৩.১ মালাধরের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল
- ৫.৩.২ অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব
- ৫.৩.৩ অনুবাদে মূলানুগত্য
- ৫.৩.৪ ভক্তিবাদ-প্রসঙ্গ
- ৫.৩.৫ বাঙালিয়ানা ও কবির কবিত্ব

৫.৪ মহাভারত অনুবাদের ধারা

- ৫.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর
- ৫.৪.২ শ্রীকর নন্দী
- ৫.৪.৩ বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্য গড়ে ওঠার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক প্রণোদনার কথা জানতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের ক্ষেত্রে কারা চৈতন্যপূর্ব যুগে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারেন

এবং কেন সে বিষয়ে ব্যাপক ধারণা করতে পারবেন। রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে বিশদ জানতে পারবেন। অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্বের নানা দিক (যেমন—কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, রসসৃজন, কাব্যনির্মিতি কৌশল, ভক্তিতত্ত্ব প্রচার, বাঙালিয়ানা প্রকাশ) নিয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে পরেবেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর ব্যক্তিপরিচয় এবং আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মাবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর কতটা মূলকে অনুসরণ করেও নিজস্বতা দেখিয়েছেন, তৎকালীন সমাজে কৃষ্ণভক্তি প্রচারে সহায়তা করেছেন এবং তাঁর কাব্যে বাঙালি সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে সে বিষয়ে জানতে পারবেন। চৈতন্যপূর্ব যুগে মহাভারতের অনুবাদে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন সেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর ব্যক্তিজীবন ও কাব্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যে কয়েকটি বিশেষ শাখায় বিকশিত হয়েছিল, অনুবাদ সাহিত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। এ শাখার সূচনা হয় চৈতন্যপূর্ব যুগে বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে। যদি সে-উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে এর গুরুত্ব আরো সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। কোন মূলকে আশ্রয় করে ভাষান্তরিত রচনাই হল অনুবাদ। 'অনু' পূর্বপদে ভাবাশ্রয়িতার বোধ খুব স্পষ্ট। এ শ্রেণীর রচনায় লেখক কোন মৌলিক কাহিনীর সষ্টা নন, কেবল ভাষান্তরীকরণের মাধ্যমে মূলের গল্প ও রস পরিবেশন করাই তাঁর লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এতে একদিকে যেমন সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত হয়, তেমনি অন্যদিকে ঘটে ভাষার সমৃদ্ধি।

মধ্যযুগে নবগঠিত বাংলাভাষার আশ্রয়ে সংস্কৃতভাষার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে আবদ্ধ শাস্ত্রকথা জনসমাজে প্রচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বিশেষ কারণে। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় তুর্কী-নেতা বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় এদেশের শান্ত-বৈচিত্রহীন নিরুদ্বিগ্ন জনজীবনকে ঘুলিয়ে দেয়। দেশব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার মানুষের মনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। তুর্কী আক্রমণের এ হেন প্রচণ্ড আঘাতে হিন্দু সমাজের ও সংস্কৃতির ভিত নড়ে ওঠে। এদেশের তথাকথিত নিম্নবর্গস্থ হিন্দুরা ভয়ে, লোভে, সাম্যের আশায় দলে দলে মুসলমান হতে থাকলে উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের টনক নড়ে। শ্রেণীস্বার্থেই তাঁদের মধ্যে জেগে ওঠে জাতিচেতনা। তাঁরা অচিরে অনুধাবন করলেন যে, হিন্দুসমাজের এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চাই ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি। ততদিনে রাজনৈতিক অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, তাই ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিন্ন চেতনায় বাঁধতে চাইলেন নড়বড়ে বৃহদায়তন সমাজকে। এই ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সুপ্রাচীন আর্যশাস্ত্র ও কাব্যনির্ভর। অতএব সংস্কৃত ভাষার নিগড়ের মধ্যে তখনো পর্যন্ত পন্দী হয়ে থাকা শাস্ত্রকথা এবার দেশীভাষায় প্রচারের উদ্যোগ নিলেন তাঁরা। ঘটলো ঐতিহ্যপূর্ণ আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে আপামর বাঙালির চিত্তসংযোগ। নির্জিত হিন্দুর মানসিক শক্তি, সাহস ও উদ্যম সঞ্চারে অনুবাদ সাহিত্যের ভূমিকা তাই অপরিসীম। প্রথম দিকে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয়, পরে নানা পুরাণ অবলম্ভবন করে অনুবাদকেরা পৌরাণিক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটান।

পণ্ডিত সমাজের একাংশ মনে করেন যে, অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক অভিব্যক্তিক ঘটেছিল কথকতার মাধ্যমে। যাঁরা পুরাণকথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সাধারণের কাছে সেসব গল্প পাঁচালির আকারে পরিবেশন করতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শূদ্র বা অন্ত্যজরা সেকালের সংস্কৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে অবতলবর্তীদের মধ্যে ধর্মপিপাসু মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে মধ্যবর্তী হিসেবে পালাগায়ক বা কথকের আবির্ভাব ঘটে। আবার সংস্কৃত ভাষাজালে আবদ্ধ শাস্ত্রকথাকে যাঁরা সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে গোঁড়া শাস্ত্রব্যবসায়ীদের ক্রোধ যে চাপা ছিল না তার প্রমাণ এই প্রবাদোপম পংক্তি—'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে বামুনঘেঁসে/এই

তিন সর্বনেশে।' তবে অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত কবিরা তাঁদের কর্মের গুরুত্ব তথা ভূমিকা সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সচেতন। ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বসু লিখেছেন—'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া। লোক-নিস্তারিতে যাই পাঞ্চালী রচিয়া।।' লোক-নিস্তারণ অর্থাৎ লোকশিক্ষাই অনুবাদের হেতু। কবি 'লোক' বলতে সেইসব মানুষকেই বুঝিয়েছেন যাঁরা সংস্কৃত বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, অথচ অবস্থাবৈগুণ্যে শাস্ত্রকথা যাঁদের অবধানের প্রয়োজন ছিল। প্রায় একই সুরে কথা বলেন ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি পীতাম্বর দাসও সপ্তদশ শতকের কবি দ্বিজ হরিদাস। নল-দময়ন্তীর আখ্যান-সূচনায় কামতারাজসভার কবি পীতাম্বর লেখেন—'পুরাণাদি শাস্ত্রে যেই রহস্য আছয়। পণ্ডিতে বুঝয়ে মাত্র অন্যে না বুঝয়।। এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার। নিজ দেশভাষা-বন্ধে রচিয়ো পয়ার।।' এ কথার প্রতিধ্বনি বাজে হরিদাসের কলমেও—'সংস্কৃত নাহি বুঝে সাধারণ জনে। ভাষাকথা কহি আমি তথির কারণে।।' আবার উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও অনুবাদ করতে গিয়ে সব রচনাকার একই আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়নি। কবির প্রকৃতি অনুযায়ী কাব্যের চরিত্র গড়ে ওঠে। কবির প্রকৃতিও নির্ধারিত হয় তাঁর পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান, কবিত্বশক্তি প্রভৃতির দ্বারা। তাছাড়া তর্জমাকারীর সাহিত্যগত উদ্দেশ্যও লেখাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল বিশুদ্ধ গল্পরস পরিবেশনের তাগিদে মূলের অতিরিক্ত অনেক অপ্রধান, এমনকি অপ্রয়োজনীয় কাহিনীও কেউ যুক্ত করে দিতে পারেন। এ সবের কারণে অনুবাদের প্রকৃতি পাল্টে যায় এবং নানা অনুবাদ বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত হয়। যেমন—আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, ছায়ানুবাদ, সারানুবাদ ইত্যাদি। নানা গ্রন্থের অনুবাদে তো বটেই, একই গ্রন্থের বিভিন্ন কবির অনুবাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা অনূদিত ধর্মাশ্রিত কাব্যে দুটি বৈশিষ্ট্য খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১. রচনায় কম-বেশি বাঙালিয়ানার অনুপ্রবেশ ও ২. ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি। প্রথমটি উদ্দিষ্ট পাটকবর্গের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তাঁদের পাঠরুচি-কেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয়টি সমকালের ধর্মভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাঙালি কবিরা সর্বভারতীয় কাহিনীকে বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী পাঠকের উপযুক্ত করে প্রকাশ করতে গিয়ে পটভূমি, চরিত্র, রসসৃষ্টি, নিসর্গপ্রকৃতি, কাব্যভাষা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্বতা দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এইসব অনুবাদের কোথাও কোথাও বাংলাদেশের ভৌমসত্তার হৃদস্পন্দন অনুভূত হয়। কিছু কবির অনুবাদ কালজয়ী হয়ে ওঠার এটাও একটা প্রধান কারণ। আর ভক্তিবাদের ক্ষেত্রে কবিদের দাসত্ববুদ্ধির অভিপ্রকাশ স্পষ্ট। অবশ্য যুগীয় পরিমণ্ডলের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা সেকালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন কবিদের ছিল না। তাঁরা ভক্তিবাদ প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থ লিখে কালের দাবিকেই সম্মানিত করেছিলেন বলে মনে হয়। অনুবাদ সাহিত্যের ধারা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চললেও আমরা এ পর্যায়ে প্রাক-চৈতন্যপর্বের তিনটি মুখ্য প্রবাহের বিশিষ্ট কবিদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবো। ধারাগুলি হলো—রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত।

৫.২ রামায়ণ অনুবাদের ধারা

ভারতবর্ষের আদিকাব্য রামায়ণ, আদিকবি ঋষি বাল্মীকি। ভারতীয় জীবন ও ভাবসত্তার সঙ্গে রামায়ণ গভীর আত্মীয়তার সূত্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নানা পরিবর্তনশলীতার মধ্যে ভারতবর্ষ যে তার আদি ও অকৃত্রিম চেহারা বজায় রাখতে পেরেছে তার মূলে রামায়ণের শিক্ষা ও আদর্শ বিপুলভাবে ক্রিয়াশীল। রামায়ণ জীবনরসের কাব্য। তাই এখানে দর্শন থাকলেও সে শুষ্ক বিদ্যা বিতরণ করে না। নরনারীর চিরায়ত প্রেম ভালোবাসা সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে ওঠে উপভোগের এক সামগ্রী। এই মহাকাব্যের সঙ্গে জাতির হৃদয়ের নিগূঢ় সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয় ভাষার ব্যক্ত করে 'রামায়ণ' প্রবন্ধে লিখেছিলনে, 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের

কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।....গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।... বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' বস্তুত বাল্মীকি রামায়ণে রাম বিষ্ণুর অবতার নন, তিনি মনুষ্যকুলের শ্রেষ্ঠ 'নরচন্দ্রমা' স্বরূপ। রামচন্দ্রকে বাল্মীকি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সম্রাট প্রভৃতি সম্পর্কের আদর্শ স্থানীয় পুরুষ করে তুলেছেন। সর্বস্তরের ভারতবাসীর কাছে রামচন্দ্র অনুসরণযোগ্য এক মহান চরিত্র। যাইহোক, বাল্মীকির রচনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে আরো প্রায় ৬/৭টি রামায়ণ ও ২/৩টি সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার ঘটনা প্রমাণ করে ভারতবর্ষের চিত্তলোকে এই মহাগ্রন্থ কত আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। রামকাহিনী শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ব্রহ্মদেশ-শ্যাম-কম্বোজ-চিন-ভিয়েতনাম-মালয়-ইন্দোনেশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার, ভিন্টারনিৎস্ মহাভারতের তুলনায় রামায়ণকে অপ্রাচীন বলে মন্তব্য করলেও অন্তবর্তী তথ্যে রামায়ণই সর্বাগ্রে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত টানতে হয়। এছাড়া রামায়ণকে কেউ কেউ রূপক হিসেবেও বিবেচনা করেন। ভারতবর্ষের আর্য সভ্যতার বিস্তারের ইতিকথা নাকি এর মধ্যে সূচিত। 'সীতা' শব্দের অন্য অর্থ 'হল্যা ভূমি'। রামচন্দ্র কর্তক লঙ্কাপুরী থেকে রাবণহত্যা করে সীতা উদ্ধারের কাহিনী অনার্যপ্রধান অরণ্যঙ্কুল দক্ষিণ দেশে কৃষিসভ্যতা পত্তনেরই ইঙ্গিতবাহী। রামায়ণে অনুস্যূত জীবনবোধ যে চিরায়ত, তার উদ্‌ঘোষণা বাল্মীকি নিজেই করে গিয়েছেন এই মহাকাব্যে—'যাবদ্ স্থাস্যন্তি গিবয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। তাবদ্ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।' এই মহৎকাব্যের অনুবাদ প্রাদেশিক ভাষায় শুরু হয় একাদশ শতকে। প্রথমে তামিলে, পরে হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষায়। পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা ভাষায়। বঙ্গদেশে রামায়ণ অনুবাদের সূচনাকার ছিলেন কবি কৃত্তিবাস—'কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলঙ্কার।'

৫.২.১ কৃত্তিবাসের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

উনিশ শতকে বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচীন পুথিসংগ্রহের আগ্রহ দেখা দিলে বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে যাঁর পুথির অনুলিপি সবচেয়ে বেশি মিলেছিল তিনি হলেন কৃত্তিবাস। এ ঘটনা কৃত্তিবাসের বিপুল জনপ্রিয়তারই স্মারক। লোকসাধারণের বোধের জগতে নতুন কিছু সংযুক্ত করতেই যে তাঁর লেখনী ধারণ এর আভাস মেলে। তাঁর উক্তিতে—'সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।' কৃত্তিবাসের কাব্য ধনীর রাজপ্রসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত পঠিত। অথচ এত বড় লোককান্ত কবির ব্যক্তিপরিচয় আজও পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মধ্যযুগের লেখা দুটি গ্রন্থে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে একটুকরো করে তথ্য দেওয়া আছে। প্রসিদ্ধ কুলাচার্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের লেখা 'মহাবংশাবলী'তে বলা হয়েছে—'কৃত্তিবাস কবির্ধীমান সৌম্যঃশান্ত জনপ্রিয়', আর জয়ানন্দ মিশ্র চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন—'রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালি করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।।' শ্রীরামপুরে কর্মরত মিশনারীরা প্রেস স্থাপন করে বাইবেলের পাশাপাশি আর যে-গ্রন্থ ছাপিয়ে প্রকাশ করেন সেটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ। প্রকাশের সুবাদে কৃত্তিবাস সম্পর্কে গবেষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তেমন তথ্য মেলে না। ১৮৩৪ সালে যখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত হয়ে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আবার বেরলো তখনো কবির জীবনকথা বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। ১৮৫২-তে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা

বিষয়ে যে-বক্তৃতা দেন বীটন সোসাইটিতে সেখানে কবির কাব্য নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও তাঁর ব্যক্তিপরিচয় অনুল্লেখিত থাকে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিত'-এ (১৮৬৯) দুটি তথ্য দিলেন—'ফুলিয়ার কৃত্তিবাস' ও তিনি 'মুরারি ওঝার নাতি'। ১৮৭০-এ ঢাকা থেকে হরিশচন্দ্র মিত্র 'কৃত্তিবাস পরিচয় সংগ্রহ' -এ রামায়ণ গায়কদের খাতা থেকে কাব্যপংক্তি উদ্ধার করে ছেপে দিলেন। তাতে পাওয়া গেল কৃত্তিবাসের পিতা ও মাতার নাম, ভাইয়ের সংখ্যা ও নাম। অনেকেই কৃত্তিবাসের জন্মসন উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনরকম প্রমাণ বা সূত্র ব্যতিরেকে। ১৮৯৬ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও জীবনী বিষয়ে কিছু জানা যায় না। কিন্তু ১৯০১ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণে দীনেশচন্দ্র আত্মপরিচয় শীর্ষক একটি রচনাংশ ছেপে দেন। তিনি এটি পেয়েছিলেন বাঁকুড়া ও হুগলীর সীমান্তে অবস্থিত বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির কাছ থেকে। কিন্তু যে-পুথি দেখে এটি তিনি নকল করেছিলেন পরে সেটিকে তার লোকসমক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। সে সময়ে মূলটি অপ্রাপ্ত হওয়ায় সকলেই ধারণা করেছিলেন এটি একটি জালিয়াতির ঘটনা। এর বহুবছর পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ভারতবর্ষ পত্রিকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী নগেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে প্রাপ্ত কত্তিবাসের আত্মবিরণী প্রকাশ করলে বোঝা গেল দীনেশচন্দ্র প্রকাশিত অংশটি জাল নয়। ভট্টশালী সংগৃহীত পুথিতে কৃত্তিবাসরে আত্মপরিচয় বিস্তৃততর। উক্ত দুই বিবরণী মিলিয়ে আমরা কবি কৃত্তিবাসের জীবনের রূপরেখা এখানে আঁকতে পারি।

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ ছিলেন নারসিংহ ওঝা। ইনি পূর্ববঙ্গে বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। একদা ঐ অঞ্চলে মুসলমান অক্রমণ ঘটলে তিনি গঙ্গার পূর্বতীর ফুলিয়াতে এসে বসবাস করতে লাগলেন। পূর্বে মালীদের বসবাস ছিল এই স্থানে। ফুলের চাষ ব্যাপক পরিমাণে হত বলে এর নাম ফুলিয়া। নারসিংহের বংশধর ছিলেন মুরারি। মুরারীর পুত্র বনমালী, যিনি কৃত্তিবাসের পিতা। তাঁর মায়ের নাম মালিনী। কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই, মতান্তরে সাত—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব শ্রীধর, বলভদ্র ও চতুর্ভুজ। আর ছিল এক ভগিনী। কৃত্তিবাস তাঁর জন্ম বার ও তিথির উল্লেখ করেছেন—'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ৷৷' কৃত্তিবাস তাঁর পিতামহ-প্রদত্ত নাম। বারো বছর বয়সে উত্তর দেশে পড়তে গেলেন বড় গঙ্গা পেরিয়ে। গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করে রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় গৌড়েশ্বরকে পাঁচ শ্লোক পাঠালেন। দ্বারী হাতে শ্লোক দিয়ে রাজার অনুমতির অপেক্ষায় রইলেন। সপ্তঘটি বেলাতে রাজার আহ্বানে নয় দেউড়ি পেরিয়ে পৌঁছুলেন। রাজা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর চারিদিকে পাত্রমিত্র। কৃত্তিবাসের উল্লেখ মতো এঁরা হলেন—জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ নারায়ণ, গন্ধর্ব রায়, শ্রীবৎস্য, মুকুন্দ। চারিদিকে নৃত্যগীত সমারোহের মধ্যে রাজা মাঘ মাসের রৌদ্রতাপের আরাম ভোগ করছিলেন আঙিনায়, 'রাঙা মাদুরি' বিছিয়ে। রাজা হাতছানি দিয়ে ডাকতে কবি তাঁর নিকটে গেলেন। চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে সাত শ্লোক পড়লেন তিনি। দেবী সরস্বতী প্রসাদে সেই রমণীয় শ্লোকে রাজা মুগ্ধ হয়ে কবিকে পুষ্পমালা উপহার দিলেন। কেদার খাঁ চন্দনের জল ছিটোলেন। উপহার মিললো পাটের পাছড়া। সভাসদরা কবিকে রাজার কাযছ থেকে আরো কিছু চেয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কবি পার্থিব সম্পত্তিবিমুখ। তিনি এই ভিক্ষা করলেন—'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ৷৷' একথায় রাজা সন্তুষ্ট হয় কবিকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ করলেন। কবি রাজসভা থেকে বহির্গত হলেন। সভার সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। অতঃপর কবি রাময়ণ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর আত্মপরিচয়ের শেষাংশে তিনি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে লিখেছেন—'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ৷৷ বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞা দান। রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ৷৷ সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস

পণ্ডিত ৷৷’ রামায়ণে কিছু লোক মনোরঞ্জক গালগল্প ঠাঁই পাওয়ায় অনেকের ধারণা কৃত্তিবাস তেমন পণ্ডিত কবি ছিলেন না। কিন্তু কবির সাক্ষ্য মেনে নিলে এ ধারণা দূরীভূত হয়ে যায়। বিপুল পাণ্ডিত্য না থাকলে বাল্মীকির কবিত্ব অনুভব করে তাঁর প্রাঞ্জল ভাবানুবাদ রচনা করা সত্যই দুঃসাধ্য কর্ম।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি প্রাপ্তির সূত্রে পরবর্তীকালের গবেষকরা তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে যত্নবান হয়েছেন। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, কবি তাঁর বিবরণে জন্মতিথি, মাস ও বার উল্লেখ করলেও শকাব্দ বা বঙ্গাব্দ কোন কিছুই উল্লেখ করেননি। তাছাড়া যে গৌড়েশ্বরের দরবারে তিনি সম্মানিত হন তাঁর সভাসদদের নাম উল্লেখিত হলেও রাজার নামটি অনুক্ত থেকে গেছে। ফলে গবেষক মহলে সৃষ্টি হয়েছে ধন্দ এবং তার সুত্রে বাদানুবাদ। আমরা সংক্ষেপে তার পরিচয় দিয়ে মোটামুটি একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার চেষ্টা করবো।

কবি আত্মবিবরণের সূচনাতেই পূর্ববঙ্গস্থিত কোন এক ‘বেদানুজ’ রাজার কথা বলেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, এটি হবে দানুজ রাজা। এখন, দানুজ নামধারী তিনজন রাজা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছেন পৃথক পৃথক স্থানে ও সময়ে। দনুজ মাধব বা দনুজ রায় ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা। আর একজন ছিলেন দনুজ মর্দন দেব, যাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৭-৯৮ খ্রিঃ। আর ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক দনুজ রায়। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা এই দনুজ রায়ের পাত্র ছিলেন।

এবার কবির উল্লেখিত বার-তিথির প্রসঙ্গ। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনানুসারে যে-বৎসর মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী রবিবরা পড়েছিল, কবির উল্লেখিত ‘পূর্ণ’ শব্দটিকে মর্যাদা দিয়ে সেই সালটি নির্ধারিত করেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৩৫৪ শক বা ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টশালীর আবিষ্কৃত পুথিতে ‘পূর্ণ’ স্থলে রয়েছে ‘পূণ্য’ শব্দটি, যা মধ্যযুগের সাধারণ লিপি-বিভ্রান্তি বলে অনেকে মনে করেন। ভট্টশালীর অনুরোধে যোগেশচন্দ্র ‘পূণ্য’ শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয়বারের জ্যোতিষ বিচারেপৌঁছন ১৩২০ শকে বা ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। এই দুই সালের মধ্যে কোন্‌টি সত্য? সে সিদ্ধান্তের জন্য অন্যান্য পরোক্ষ সূত্রের সাহায্য প্রয়োজন। এখন সেগুলির অনুসন্ধান করা যাক।

১. কুলপঞ্জিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খান ও খুড়তুতো ভাইয়ের পৌত্র গঙ্গানন্দ ফুলিয়া মেলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ততদিনে কৃত্তিবাস পরলোক গমন করেছিলেন। নইলে তাঁর মতো খ্যাতিমান মানুষের জীবিতকালে কেমন করে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা বংশের প্রতিনিধিত্ব করেন?

২. জয়ানন্দর চৈতন্যমঙ্গলে আছে, মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানে ফুলিয়া নিবাসী হরিদাস আনুমানিক ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ স্বগ্রাম ত্যাগ করে নীলাচলে যাত্রা করেন। তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদ সুষেণ পণ্ডিত। ইনি ফুলিয়ার বিখ্যাত কুলীন মনোহরের পুত্র, কৃত্তিবাসের খুড়তুতো ভাই লক্ষ্মীধরের পৌত্র, অর্থাৎ সম্পর্কে কৃত্তিবাসের পৌত্র। তখন তাঁর মধ্যবয়স। অতএব এর থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন এমন অনুমান করা বিধেয়।

উপরোক্ত দুই যুক্তির বলে সমৃদ্ধ হয়ে কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দ বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন। এবার প্রশ্ন তিনি কোন্ প্রশাসকের রাজসভায় সম্মানিত হন? কবির যে-বর্ণনা দেখা যায় তাতে সংবর্ধনায় হিন্দু রীতিরই প্রাধান্য। রাজার সভাসদরা সবাই হিন্দু। ইনি কি কোন হিন্দু রাজা? তাহলে কবি তাঁর নাম উল্লেখ করেন না কেন? ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন, গৌড়ে ঐ সময়ে একজনই মাত্র হিন্দু রাজা ছিলেন, তিনি গণেশ। যিনি

১৪১৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁর সভাতে কবি পৌঁছুলে তখন তাঁর বয়স হয় বিশ বৎসর। তাছাড়া এতবড় কাব্য নিশ্চয়ই এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয়নি। ১৪১৮ সালে গৌড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। গণেশের পুত্র যদু জালালুদ্দিন নাম ধারণ করে সমস্ত হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের পক্ষে এইরকম অবস্থায় কাব্য লেখা সম্ভব হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

সেজন্য রাজা গণেশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করেননি। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণন্দ্রকুমারর বসু কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের পক্ষে যুক্তি, কংসনারায়ণের পাত্রমিত্রের সঙ্গে কৃত্তিবাস উল্লেখিত গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্রের নামসাদৃশ্য আছে। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র ধরে কংসনারায়ণকে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপন করা যায় না। সেজন্য অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় নতুন কিছু তথ্যের সংযোগে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন যে গৌড়েশ্বরটি হলেন রুকনুদ্দিন বরবক শাহ। ইনি বিদ্যোৎশাহী, গুণীর প্রশংসাকারী ও বাঙালি হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষক, এঁর রাজসভায় মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে বিরুদ্ধধর্মের স্পর্শ রাখবেন না বলে সমস্ত হিন্দু পাত্রমিত্রের নাম লিখলেও গৌড়েশ্বরের নামটি উহ্য রেখেছেন। তাছাড়া রাঙা মাজুরী পেতে রোদ পোহানো এই মুসলিম প্রশাসকের পক্ষেই বেশি সম্ভভব। অবশ্য এ ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত টানা এখনও সম্ভভব হয়নি। তবে অধিকাংশ গবেষক ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দকেই কৃত্তিবাসের জন্মসন বলে মেনে নিয়েছেন।

৫.২.২ অনুবাদে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব

বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ অনুবাদের কৃতিত্বের দাবিদার কৃত্তিবাস ওঝা। বাল্মীকির কাব্যের হুবহু অনুবাদ তিনি করেন নি, করেছেন ভাবানুবাদ। বাঙালির গল্পরসের চাচিহদার দিকে তাকিয়ে যেমন কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন, তেমনি শিশু মনোরঞ্জক গালগল্পের আয়োজন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বা উৎস কেবল বাল্মীকি ছিলেন না, জৈমিনী রচিত মহাভারতও তাঁকে আখ্যান যুগিয়েছিল। মূল রামায়ণের কাহিনী-কাঠামো অটুট রেখে এইরকম গ্রহণ-বর্জন কৃত্তিবাসের রচনাকে স্বাদু ও উপভোগ্য করে তুলেছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে মৌলিক ভাবনার পরিমাণও কম নয়। গল্পের ক্ষেত্রে, চরিত্রচিত্রণে, রসপরিবেশনে, প্রবাদ-প্রবচনে কৃত্তিবাস নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আসলে তিনি উদ্দিষ্ট পাঠক কিংবা শ্রোতার কথা ভেবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে এইসব বিশিষ্টতা তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর বিশদ কৃতিত্ব পরিমাপে আমরা আলোচনাটিকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করতে পারি—

৫.২.৩ কাহিনী-গ্রন্থনে মৌলিকতা

আখ্যানধর্মী সাহিত্যে কাহিনী সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপাদান। কৃত্তিবাসরে সময়ে রচনাকর্মে চরিত্রের চাইতে বৃত্তের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো বেশি। কবিও রীতির বাইরে পা রাখেননি। কৃত্তিবাস যখন অনুবাদে হাত দিচ্ছেন সেই সময়ে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে গেছে রামভক্তিবাদ। তিনি যে বিষ্ণুর অবতার সে বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত। তাই বিষ্ণুর চারি অংশে বিভক্ত হয়ে দশরথের চারপুত্র রূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী দিয়ে সূচনা হয়েছে আদিকাণ্ডের। এরপর রামাদি চার ভ্রাতার সঙ্গে সীতাসহ অন্য তিন ভগিনীর বিবাহ, তাড়কাবধ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন—এ কাণ্ডের মূলকাহিনী। এর মধ্যেও দু' একটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশ করেছেন কৃত্তিবাস। যেমন—চন্দ্র ও সূর্যবংশের বিবরণ। বাল্মীকি সূচনায় যে কাহিনী-সংক্ষেপ দেন সেটা ছেঁটে বাদ দিয়েছেন আমাদের কবি। অযোধ্যাকাণ্ডেও দু'একটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখা গেছে। যেমন—দশরথ কৈকেয়ীকে যে-দুটি বরের কথা

জানিয়েছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা একটি বররূপেই কথিত। বনগমনের পূর্বে রামের বনবাসের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণ যে যুক্তি প্রদর্শন করে বাল্মীকিতে তা তেমনভাবে পাওয়া যায় না। এই কাণ্ডের মূল উপজীব্য রামচন্দ্রের বনবাস এবং তার পিছনে কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি ও মন্থরার প্ররোচনা। কৃত্তিবাস অন্যভাবে কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুরতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কবির ব্যাখ্যা ঃ তাঁর ষড়যন্ত্রের ফলেই তো রামচন্দ্র বনবাসে যেতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত দুরাচারী রাবণধ্বংস সম্ভব। আসলে ভক্তিরসের কারবারী কৃত্তিবাস এভাবে একটি নৃশংস ঘটনাকে ধর্মতত্ত্বের মোড়ক দিয়ে পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া বনবাসী রামচন্দ্রকে দেখে ভরদ্বাজমুনি যেভাবে তাঁর চরণবন্দনা করেন, তাও বাল্মীকি রামায়ণে দুর্লভ। বলা বাহুল্য যে, কৃত্তিবাস তাঁর রামচন্দ্রে দেবত্ব আরোপ করে তাঁকে সকলের পূজ্য করে তুলেছিলেন। নন্দীগ্রামে ভরতের কুস্বপ্ন দর্শনও বাল্মীকিতে মেলে না। দূতের দ্বারা নীত হয়ে ভরত যখন অযোধ্যায় এসে সমস্ত ঘটনা অবগত হলেন, তখন তিনি জননীর উপর চরম আক্ষেপে ও আত্মধিক্কারে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা কৃত্তিবাস করলেও মূলে নেই। অযোধ্যাকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সীতা কর্তৃক মৃত দশরথের অতৃপ্ত আত্মাকে বালির পিণ্ডদান এবং চারজন সাক্ষীর প্রতি সীতাবেদীর অভিশাপ ও আশীর্বাদ প্রদান। এটি পুরোপুরি কৃত্তিবাসের কল্পিত। ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গু ও বটবৃক্ষ নিয়ে বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে লোকসংস্কার প্রচলিত ছিল, কৃত্তিবাস এ ঘটনায় তার কাব্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অরণ্যকাণ্ডেও অত্রিমুণির পত্নী অনসূয়ার কাছে সীতা আপন জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন—যা আদৌ বাল্মীকিতে নেই। মূল রামায়ণে রাম কর্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধের পর সুতীক্ষ্ণমুণির উপাখ্যান আছে, যা কৃত্তিবাস প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। অগস্ত্য কর্তৃক ইল্বল নিধনের কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। এভাবে কাণ্ড ধরে বিচার করে গেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণে অজস্র পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্জনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। আসলে বাঙালি পাঠকের উপযোগী করে কাহিনী পরিবেশনের দিকেই কৃত্তিবাসের নজর ছিল, মূলের বিচ্যুতি নিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তায় কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। সেজন্য কার্তিকের জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, অম্বরীষ যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়গুলি বাদ দিয়েছেন, পরিবর্তে সংযুক্ত করেছেন সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, গণেশের জন্ম, গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ, বীরবাহুর যুদ্ধ, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, সীতা কর্তৃক রাবণের মূর্তি অঙ্কন ইত্যাদি ঘটনা। এসব গল্প বলতে কবিকে হাতড়ে ফিরতে হয়েছে জৈমিনী ভারত, স্কন্দপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, কূর্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবী ভাগবত, অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ ঘটাতে হনুমান যে বিশল্যকরণী এনেছিল সে ঘটনা অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ ঘটাতে হনুমান যে বিশল্যকরণী এনেছিল সে ঘটনা অদ্ভুত রামায়ণে কথিত। জৈমিনী ভারত থেকে নিয়েছেন লব-কুশের দ্বারা ভরত-শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাভূত ও নিহত হলে বাল্মীকির প্রসাদে তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ। দস্যু রত্নাকর 'মরা' 'মরা' বলে যে শাপমুক্ত হয়েছিল এ কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে গৃহীত। হরিশচন্দ্রের উপাখ্যানটি এসেছে দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে। ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তের উৎস যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ। গঙ্গা আনয়নের কাহিনী মেলে স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে। ঐ পুরাণে রয়েছে দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপের কথা। কৃত্তিবাস কুম্ভকর্ণ হত্যায় সীতার দেহ থেকে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাবের কথা জানিয়েছেন, যার উৎস অদ্ভুত রামায়ণ। এইভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ হয়ে উঠেছে ভারতীয় পুরাণকথার সমাহার, তবে অবশ্যই বাল্মকি তাঁর মূলাশ্রয়।

৫.২.৪ চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনবত্ব

যে কোন কবির কাব্য গড়ে ওঠে যুগীয় পরিমণ্ডলের জল-আলো-বাতাসে। চরিত্রও তার অন্তর্গত। যুগের বিশিষ্ট দাবি বহন করে জন্ম দিতে পারে কোন কোন চরিত্র। থাকতে পারে তাতে যুগের ত্রুটি, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতাও।

কৃত্তিবাস তুর্কী আক্রমণোত্তর পঞ্চদশ শতকের বাঙালি সমাজের কবি। মুসলমান আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশ শুধু অন্য শক্তির করতলগত হয়নি, ভেঙে পড়েছে প্রাচীন নীতি-আদর্শের কাঠামো, বিপর্যস্ত হয়েছে সমগ্র হিন্দুসমাজ। এ হেন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের উন্নত চরিত্র আশা করা অন্যায়। তাছাড়া কৃত্তিবাস লিখতে চেয়েছেন লোকমনোরঞ্জন পাঁচালী। মহাকাব্যের মহৎ, বৃহৎ সমুন্নত চরিত্রের অবস্থান সেখানে বড় বেমানান। ফলে তাঁর চরিত্রগুলি হয়েছে লোকজীবনানুগ। তাছাড়া বাল্মীকির তুলনায় বাঙালি কবির প্রতিভার আপেক্ষিক দীনতাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। সব মিলিয়ে বাংলা রামায়ণের চরিত্রগুলি মূলের তুলনায় খর্বাকার, তেজোহীন অগৌরবান্বিত হয়ে গেছে। তবুও কৃত্তিবাস এতে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা সঞ্চার করে কিছুটা চোহারা দিতে সমর্থ হয়েছেন। ভক্তিবাদ কৃত্তিবাসের কাব্যে অতিরিক্ত এক উপাদান। মুখ্যত দেশজোড়া রাম ভক্তির উচ্ছাসের পটভূমিতে এ কাব্যের সৃষ্টি। রামচরিত্রে এই নতুন মাত্রা যোজিত হওয়ায় রঘুকুলবীরের স্বভাব বহুলাংশে পরিবর্তিতত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। রামচন্দ্র এখানে যতখানি ক্ষত্রিয় বংশের বীর নায়ক, তার তুলনায় বেশি প্রেমের দেবতা, ভক্তিরসের আশ্রয়, ভক্তবৎসল ভগবান। এ রামচন্দ্র রোদনপ্রবণ বাঙালির স্বভাবসাযুজ্যে মনের মানুষ। তাঁর চোখে বিরহ-অশ্রুর আবির্ভাব সীতাহরণে, সীতার বনবাসে, সীতার পাতাল গমনে। তিনি রাজকীয় আভিজাত্য ছেড়ে আবেগব্যাকুল হয়ে উঠেছেন কোথাও কোথাও। নীতিপ্রচারেও যথষ্ঠ আগ্রহী। রামের সঙ্গে সঙ্গতি রেকে কৃত্বিাসের সীতাও হয়ে ওঠেন অশ্রুমুখী বঙ্গকুলবধূ। নিতান্ত দু'একটি বিশিষ্ট জায়গা ছাড়া কৃত্তিবাস সীতাকে সমগ্র বঙ্গকুললক্ষ্মীর আদর্শ বা মডেল করে তুলতে চেয়েছেন। পতিভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন গড়ে তোলা হয়েছে সীতার সমস্ত কথাবার্তায় ও আচরণে। নারী পুরুষের ছায়ানুগামিনী—এই জাতীয় সামাজিক ধারণার পোষকতা করেন সীতা। অরণ্যকাণ্ডে রাবণ কর্তৃক অপহরণের আগে স্বামীপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে দেবর লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করেছেন, তার কুটিরে স্থিতিকে দুরাত্মার ছল বলে বিবেচনা করে পুরুষ কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। লক্ষ্মণ চরিত্রেও পরিবর্তন সাধন করেছেন কৃত্তিবাস। তাঁর লক্ষ্মণ উদ্ধত, অবিনয়ী। ভরত সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ আছে। বনবাস যাত্রার পূর্বে যেভাবে লক্ষ্মণ যুক্তিবিন্যাস করেছে তাতে একদিকে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া দশরথের স্ত্রৈণতা ও কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা বাল্মীকি রাময়ণ থেকে কৃত্তিবাসী পাঁচালিতে সংক্রামিত হলেও তা যেন বড়ই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। দশরথ কৈকেয়ীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেও বাল্মীকির দশরথের মতো চরম রূঢ় কথা বলতে পারেননি। আবার কৈকেয়ী যেন নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করেন বনবাসযাত্রী রামলক্ষ্মণের হাতে বল্কল তুলে দিয়ে। এমকি যাত্রার পূর্বে রাম বিদায় প্রার্থনা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করলে কৈকেয়ী বিমুখ হন। হনুমানের চরিত্রও অনেকাংশে বাঙালি ঘরের অনুত ভৃত্যের মতোই। রাবণ ও ইন্দ্রজিতের যে-পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নিতান্ত রাক্ষসচরিত্র নয়। রাবণ ছদ্মবেশে রামেরই ভক্ত। তিনি শত্রুভাবে বিষ্ণুর কাছে মুক্তি পেতে চান। তাঁর রাম-বিরুদ্ধতার তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি হারিয়ে যায় যখন তিনি মৃত্যু পথযাত্রায় অগ্রণী হয়ে বলেন—'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন। দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।। চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার। শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার॥' এইভাবে প্রায় সমস্ত চরিত্রের বঙ্গীয়করণে কৃত্তিবাস আপন কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। মহাকাব্যিক চরিত্রের আদিমতা, গাম্ভীর্য, সমুন্নতি কোনটিই বাংলা অনুবাদে রক্ষিত হয়নি, অথচ লৌকিক পাঁচালির উপযোগী চরিত্র হয়ে ওঠায় কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-ভরত-কৈকেয়ী-দশরথ-রাবণ-মন্দাদরী এককভাবে বঙ্গীয় পাঠককুলের আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

৫.২.৫ রসসৃজনে দক্ষতা

কাব্য রসের আশ্রয়। কেননা আলংকারিকদের সিদ্ধান্ত : 'রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্'। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে তাঁদের বিধান এখানে নয়টি প্রধান রসের উপস্থিতি থাকলেও চারটি রসের মধ্যে যেকোন একটি অঙ্গীরস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। উক্ত চারটি রস হল—শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও শান্ত। বাল্মীকির রামায়ণ করুণরসের কাব্য। অনুবাদক কৃত্তিবাসও মূলকে অনুসরণ করে করুণরসকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত রামায়ণের অধিকাংশ কাহিনীই বেদনাঘন। আখ্যানের সূচনায় রাজ্যাভিষেক থেকে রামকে প্রতিনিবৃত্ত করে কৈকেয়ী কর্তৃক বনে পাঠানো, পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু, রামের নির্বাসনে অযোধ্যাবাসীর ক্রন্দন, কৌশল্যার হাহাকার, অরণ্যে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, সীতার অদর্শনে রামের বিলাপ, রাম কর্তৃক বালীবধ, বালীর পত্নী তারার ক্রন্দন, রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ এবং শেষ পর্যন্ত রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু, মন্দোদরীর বিলাপ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তিত সীতার বিরুদ্ধে অপবাদ ও সে কারণে সীতার বনবাসে প্রেরণ এবং সবশেষে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতালপ্রবেশে ঘটনা যথেষ্ট মর্মান্তিক ও করুণরসের আশ্রয়। কৃত্তিবাস এসব ঘটনার বর্ণনায় বাল্মীকিকে যথাসম্ভব অনুসরণ করে গেছেন। বাঙালি স্বভাবতই কোমলপ্রাণ। তারই উপযুক্ত করে আখ্যান পরিবেসিত হওয়ায় স্থানগুলিতে করুণরসের প্রবাহ কোথাও কোথাও তরলতায় পর্যবসিত। তবে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলে বাঙালি পাঠকের কাছে গৃহীত হওয়ায় করুণরসের মানবিক আবেদন কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হয়ে গেছে।

প্রাচীন মহাকাব্য মাত্রেই যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা সম্বলিত আখ্যান। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অঙ্গীরস তাই বীররস রামায়ণে অনেকগুলি যুদ্ধের (রামলক্ষ্মণের তাড়কাবধ, খরদূষণের যুদ্ধ, বালিবধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, লবকুশের যুদ্ধ প্রসঙ্গ আছে। স্বভাবতই এ স্থানগুলিতে বীররসের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু কৃত্তিবাস মূলকে অনুসরণ করলেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এর কারণ মুখ্যত দুটি বলে মনে হয়। প্রথমত, ভক্তিরসের অহেতুক অনুপ্রবেশ ও দ্বিতীয়ত, যুগীয় পরিমণ্ডলে বীর-আদর্শের অভাব। ভক্তিরসে কাহিনী ও চরিত্র দ্রবীভূত হওয়ার ফলে বীররসের গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি দুইই নষ্ট হয়েছে। এই ব্যাপারটি বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় লঙ্কাযুদ্ধে রামের বিপক্ষে যারা সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই বীরবাহু, তরণীসেন, এমনকি রাবণের মধ্যেও। তারা ছদ্মবেশী রামভক্ত। ফলে তাদের আচরণে, উক্তিতে কোথাও কোন রৌদ্রস্বভাব ফুটে ওঠেনি। সমকালের বাংলাদেশেও নির্জিত হিন্দু বাঙালির অবস্থান। তাঁরা তখন শক্তিহীন, দুর্বল। অনন্যোপায় হয়ে অন্য ধর্মের মানুষের অধীনত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে এহেন পরিস্থিতিতে মানসিক দুর্বলতা ও নিয়তিবাদের প্রকোপ ঘটা স্বাভাবিক। এ দুইই বীররসের পরিপন্থী। কৃত্তিবাস তাঁর রচনায় বীররসের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভে অক্ষম হন এই যুগীয় মানসিকতার দ্বারা পুষ্ট ছিলেন বলে। তাছাড়া ভক্তির আতিশয্যও বীররসকে তার স্বস্থান থেকে চ্যুত করেছিল।

অথচ কৃত্তিবাসের খ্যাতি মুখ্যত নির্ভর করেছে এমন একটি রসের সিদ্ধির উপর, যার অবস্থান আলংকারিকদের নির্দেশের বাইরে এবং যেটি রামায়ণ মহাকাব্যের অঙ্গরসের পরিপন্থী। সে রস হাস্যরস। বস্তুত রঙ্গব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকতায় কবি সব শ্রেণীর রসসৃষ্টির প্রয়াসকে অতিক্রম করে গেছেন। এর পিছনের কারণগুলি অনুধাবনযোগ্য। কৃত্তিবাস লোকরুচির অনুগত করে পাঁচালী লিখতে চেয়েছিলেন, বোধহয় বিদগ্ধ পাঠকের রসাস্বাদনযোগ্য মহাকাব্য রচনায় তাঁর তত বেশি আগ্রহ ছিল না। সেকালের পল্লীনির্ভর গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালির রসবোধ লগ্ন হয়েছিল ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি ও পরিহাসপ্রবণ চটুলতায়। অন্তত কৃত্তিবাস নানা স্থানে মূল আখ্যানের বাইরে যেসব স্বাধীন কাব্যপ্রসঙ্গ যোজনা করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, তিতিন গ্রামীণ বাঙালির রুচিবোধকেই প্রাধান্য দিয়ে কলম হাতে এগিয়ে গিয়েছেন, মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যরক্ষার দায়বোধ তাঁর ছিল না। এত কিয়ৎ পরিমাণে করুণরস বিঘ্নিত হলেও তিনি অবলম্বিত আদর্শ থেকে সরে আসতে পারেননি। হয়তো এক্ষেত্রে লোকপ্রিয়তার হানি

ঘটার আশঙ্কা তাঁর ছিল। তবে তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সেকালের বাঙালির যথার্থ স্বরূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। তাঁর রচিত দু'একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা গেল।

কবি লঙ্কেশ্বর রাবণের শক্তিমত্তা নিয়ে উপহাস করেছেন হরধনু উত্তোলনের প্রসঙ্গে। সীতাকে বিবাহ করতে এসে বিপুল ওজনের ধনু তুলতে অসমর্থ হলে কবি বড়িম্বিত রাবণ সম্বন্ধে লিখেছেন—'কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে। মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥' সীতা অন্বেষণে গিয়ে হনুমান লঙ্কাপুরীতে বন্দী হলে তাকে নিয়ে রাক্ষসীরা পরিহাস শুরু করলে সেও রসিকতা করে বলে—'রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী। সুন্দরী শাশুড়ি পাব রাণী মন্দাদরী।। ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর। আর কি হনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর।। প্রমীলা শালাজ পাব পরমা রূপসী। রসরঙ্গে তাঁর সঙ্গে রব দিবানিশি।।' লঙ্কাকাণ্ডে 'অঙ্গদের রায়বার' একটি বিশিষ্ট অংশ। এতে উত্তরোল হাস্যরসের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের অনেক কবি কেবল ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে লোক হাসানোর জন্যে কাব্য লিখেছেন। যাইহোক, কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়েছেন অঙ্গদের বচনে। রাবণ ও অন্যান্য সভাসদরা যখন রাক্ষসী মায়ায় শত শত রাবণ মূর্তি ধরে অঙ্গদকে বিভ্রান্ত করতে চাইলো, তখন ইন্দ্রজিতের প্রতি অঙ্গদের বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—'যে তোর দারুন পণ তেমন করে কে। কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।।' তার গালির মধ্যে বালি কর্তৃক রাবণের বন্দীত্বের ঘটনাও টিপ্পনী সহকারে উল্লেখিত—'হিতোপদেশ কি বুঝিবি শুন্‌রে ব্যাটা গরু। তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্তি কল্পতরু।। নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে কি বলি। লোকে বলবে এই ব্যাটাকে বেঁধেছিল বালি।।' এইসব দৃষ্টান্ত সূত্রে বলা যায়, বাঙালির রসরুচি সেকালে খুব উন্নত ছিল না। একদিকে আদিরস ও অন্যদিকে হাস্যরস—এই দুইয়ের সীমার মধ্যে দুর্বলশক্তি, হীনবীর্য নিরুদ্যমী বাঙালি বসবাস করছিল। কৃত্তিবাস এদেরই জন্য কাব্য লিখতে গিয়ে মূল আদর্শ থেকে স্খলিত হয়েছিলেন। যুগের দাবির কাছে তাঁর এই আত্মসমর্পণ সেকালের কবিদের অনিবার্য ভবিতব্য ছিল।

৫.২.৬ কাব্যনির্মিতি কৌশলে বিশিষ্টতা

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্যের কাহিনী গঠনে অনুবাদকের তেমন কোনো নিজস্বতা থাকে না। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো মূলের ভাষারূপ বজায় রাখতে পারেন, যদি দুই ভাষার মধ্যে উৎসগত কোন যোগাযোগ থাকে। কৃত্তিবাস সংস্কৃত থেকে বাংলা করেছেন। ভাষার যোগ থাকা সত্ত্বেও বাল্মীকির কাব্যভাষা তিনি অনুসরণ করেননি। প্রাচীন কবির ভাষা উদাত্ত, গম্ভীর ও অলংকৃত। পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করতে গিয়ে কৃত্তিবাস ভাষার এইসব বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছিলেন। তবে মোটের উপর কৃত্তিবাসের ভাষা সরল ও প্রসাদগুণযুক্ত। হাস্যরসের স্থানগুলিতে ভাষা তরল। তাঁর খেয়াল ছিল তিনি পাঁচালি লিখছেন। সেই অনুযায়ী সেকালের বিখ্যাত দুই ছন্দোবাহন পয়ার ও ত্রিপদী কৃত্তিবাসের অবলম্বন ছিল। অবশ্য সে সময়ে পয়ার তার নির্দিষ্ট ১৪ মাত্রায় নিয়মিত ছিল না। কোথাও বেশি, কোথাও কম। মনে রাখতে হবে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী লেখা হয়েছিল গেয় কাহিনী কাব্য হিসেবে। গানে অক্ষরের বা মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাকতে পারে। সুরের টানে অক্ষর বা মাত্রার এই ন্যূনতা পূরণ করা হয়। বর্তমানে যেসব গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে তাতে খুব একটা পয়ারের চালে অসমতা দেখা যায় না। কারণ পুথি বারবার লিপিকরণের ফলে লিপিকরদের হস্তক্ষেপে ছন্দের ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে, বাকিটা পূরণ করে দিয়েছেন আধুনিক কালের কাব্যসচেতন সম্পাদকগণ। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে পয়ারের ছত্রে এখনও অধিকাক্ষর রয়ে গেছে। যেমন—'টলবল করিয়া উপরে পর্বতের ঘোড়া', 'দূর হইতে দেখে তারে কুম্ভকর্ণ মহাবলী', 'মুনির গায়ে সানার টোপর হইল খান খান', 'নখরের চিহ্ন দিল পর্বতের চারিভিতে', 'ওলটি পালটি চাহেন রাম গোদাবরীর তীর' ইত্যাদি। ত্রিপদীর

ক্ষেত্রে ৮/৮/১০ মাত্রার ত্রিপদী বেশি লিখেছেন কৃত্তিবাস। মুখ্যত ঘটনা বর্ণনায় পয়ার ও দৃশ্য বর্ণনায় ত্রিপদী তাঁর অবলম্বন। ছড়ার ছন্দ তখন ধামালী নামে পরিচিতি। এটি চারমাতার দ্রুতলয়ের ছন্দ। কৃত্তিবাসে তারও আভাস পাওয়া যায় অঙ্গদের রায়বারে। বিষয়ের লঘুতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছন্দ যোজনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন কৃত্তিবাস।

কাব্যদেহের প্রসাধনে অলংকার প্রাচীনকাল থেকে নিয়োজিত। কবির ব্যবহৃত অলঙ্কারে তাঁর কাব্যের দ্বৈত প্রকৃতি আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট। বাল্মীকি শীলিত কাব্য তাঁর আদর্শ। সে সূত্রে কিছু সংস্কৃত অলংকার ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে গ্রামীণ শ্রোতার রসবোধের কাছে বিপুল আবেদন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম এমন সাধারণ অভিজ্ঞতাকেও উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর ফলে বৈচিত্র্যময় স্বাদ সঞ্চারিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কয়েকটি অলংকারের উপর চোখ রাখা যাক—

সংস্কৃতানুগ অলঙ্কার ঃ

১. নিদ্রায় আকুল রামা হল অচেতন।
চরণ পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ ॥

২. বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।

৩. চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥

দেশী অলঙ্কার ঃ

১. তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।

২. কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥

৩. জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।

৪. কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে।

বলা বাহুল্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ দেশী অলঙ্কারগুলিতে।

৫.২.৭ ভক্তিবাদ প্রচারে সফলতা

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ এক দেশ। এদেশের সাহিত্য-শিল্পকলায় ধর্মীয় অনুভূতির প্রাধান্য। জল-হাওয়া-মাটির গুণে এখানে রক্তমাংসের মানুষও দেবতায় পরিণত হয়। রামায়ণী কথা সর্বপ্রথম মানবকথার সারাৎসার রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বাল্মীকির রাম সমস্ত মাবকুলের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে তিনি হয়ে ওঠেন বিষ্ণুর এক অবতার। তখন তাঁকে ঘিরে সমগ্র ভারতে রামভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যে রামচন্দ্র দেবালয়াশ্রিত দেবতা হিসেবে পূজা পেতে শুরু করেন। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম ও শেষ কাণ্ডে, অধ্যাত্ম, অদ্ভুত ও যোগবিশিষ্ট রামায়ণে রামের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে একাদশ শতকে সন্ধ্যাকর নন্দী যে 'রামচরিত' লেখেন সেখানে রামকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি, লেখমালা, মূর্তিশিল্পে ও মন্দিরসমূহে রামসীতার একত্র উল্লেখ ও অবস্থান এবং তাঁদের পূজাপ্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয় চৈতন্যপূর্বযুগে রামচন্দ্র এদেশের মানুষের কাছে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। পনের শতকে কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন তখন তিনিও এই ধর্মীয় সংস্কৃতির

ঐতিহ্য স্বীকার করে অনুবাদে অগ্রসর হন। কৃত্তিবাসীর রামায়ণে ভক্তির দুটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দুটি যথাক্রমে নামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ ও পরাৎপরা আদ্যাশক্তির বাৎসল্যভাব। মনে রাখতে হবে, বাংলার মাটিতে তখনো চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেনি। আসলে এ ভক্তির উৎস লুকিয়ে ছিল অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণে। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তিতত্ত্বের আকর। খুব সুন্দর মেধাবী বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদকে উল্লেখ করে লিখেছেন—'কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধর্মপাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাহার ভক্ত। রাবণ শত্রুভাবে তাহার কাছে হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।'

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু কিছু কাব্যপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে কৃত্তিবাস কর্তৃক প্রচারিত রামভক্তিবাদের স্বরূপ লক্ষ করা যাক। দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হওয়ার প্রসঙ্গ বাল্মীকি রামায়ণে নেই, রয়েছে অদ্ভুত রামায়ণে। কবি সেই কাহিনী সংযুক্ত করে দেখালেন পাপী রত্নাকর কিভাবে 'মরা' 'মরা' বলতে বলতে 'রাম' নামে উদ্ধার পেয়ে আদিকবি বাল্মীকিতে পরিণত হলেন। রামনাম জগত্তারণের উপায়। একবার জপেই কোটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধ করার ফলে রাজা দশরথের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মুনি তাঁকে অভিশপ্ত করেন। পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে রাজা বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের নির্দেশে তিনবার রাম নাম জপ করেন। বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বলেন, 'এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥' এমনকি পুত্রকে তিনি চণ্ডাল হওয়ার অভিশাপ দেন। লঙ্কাযুদ্ধে অনেক বানর সৈন্য ও রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। অথচ রামের পক্ষ অবলম্বন করেও বানরদের সদ্‌গতি হয়, মুক্তিলাভ করে রামের বিপক্ষদল রাক্ষসরা। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ইন্দ্র যে কথা বলেন তাতে স্পষ্টত নামভক্তিবাদের জয় সূচিত হয়েছে। ইন্দ্র বলেছেন, 'বারণের মার বলি কপিগণ মরে। উদ্ধার পাইবে বল কি রামের জোরে ॥ রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস। রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ॥' হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের দাস। তার মধ্য দিয়ে কবি দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। হনুমান তার হৃদয় চিরে রামসীতার যুগল মূর্ত্তি দেখায়। দুর্বল হনুমানের শক্তি তো রামচন্দ্র। হনুমানের উক্তি—'দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল। তোমা বিনা নাহি কিছ হনুর সম্বল ॥' রামচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রেমের দেবতা। তাঁর ক্ষত্রিয় পরিচয়, পৌরুষ, বীর্যবত্তা সেভাবে উপস্থাপিত নয়। কবি ভক্তির গঙ্গোদকে শত্রু পক্ষের মানুষ তরণীসেন, রাবণ প্রমুখকে স্নান করিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছেন। তরণীশেন সমস্ত দেহে রামনাম লিখে যুদ্ধে আসে। এ হেন ভক্তের দেহে রামচন্দ্র কিভাবে অস্ত্রাঘাত করবেন। সীতা উদ্ধারের ইচ্ছা তাঁর মুহূর্তে উবে যায়। তরণীসেন যুদ্ধে মারা পড়লে তার কাটামুণ্ড রামনাম করতে করতে স্বর্গলোকে উড়ে যায়। রাবণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে অশুভ লক্ষণ দেখে মন্দোদরী স্বামীকে নিরস্ত করতে চাইলে রাবণের বক্তব্য—'মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে। যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥ বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।' কবি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রায় সূচনাভাগে রামনামের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করেছেন। নিজে প্রণিপাত হয়েছেন দেবতার চরণে। ভবসিন্ধু পার হওয়ার ক্ষেত্রে রামনামই যে ভেলা একথা বলতে তিনি ভোলেননি। তিনি লিখেছেন, 'রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা। সংসার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা ॥ রাম নাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়। ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥' পুরোপুরি ভক্তের দৃষ্টিতে লেখা এ কাব্যে সেকালের ভক্তিভাবুক বাঙালি আপন আধ্যাত্মজীবনের স্পর্শ খুঁজে পেয়েছিল। বাঙালির জীবনসাধনার সঙ্গে এ

পাঁচালির আত্মিক মিলের জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাংলার জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হতে পেরেছিল। আর ছিল এর বিশিষ্ট গুণ বাঙালিয়ানা, যাতে এ জাতির মর্মকথা উচ্চারিত। কবি কৃত্তিবাসের ছ'শো বছর ধরে টিকে থাকার সেটাই আসল রহস্য। সে প্রসঙ্গ এ অধ্যায়ের সমাপ্তি-প্রসঙ্গ।

৫.২.৮ বাঙালিয়ানা প্রকাশে অনবদ্যতা

বৃহত্তর ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন দেখা শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগে রাজনৈতিক কারণে। প্রাচীনযুগের সম্রাটরা প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করলেও সংস্কৃতি ও জীবনাচরণগত পার্থক্য রয়ে গিয়েছিল। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের এক ভুখণ্ড। এখানকার জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে যে-বাঙালি জাতি তার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জাতিগত লক্ষণগুলিই বাঙালিয়ানা নামে কথিত। তার দৈনন্দিন জীবন, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠান, বারোমাসের পাল-পার্বণ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, সুনির্দিষ্ট কর্মধারা, বাগ্‌ভঙ্গিমা এসব কিছুই বাঙালিয়ানার অন্তর্গত। বঙ্গের নিসর্গপ্রকৃতি, নদনদী, মাটি, গাছপালা, পশুপাখিও বৃহত্তর অর্থে বাঙালির বাঙালিয়ানাকে নির্মিত করে দিয়েছে। ফলে কোন কবির লেখায় যখন এর প্রসঙ্গ ওঠে, বুঝতে হবে তাঁর কলমে বাঙালির এই নিভৃত নিজস্ব জীবনভঙ্গিটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

কৃত্তিবাস সর্বভারতীয় রামায়ণী কথাকে বিশিষ্ট আঞ্চলিক রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, যেমনটা দেখা যায় তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এ। কবির পাঁচলি কাব্যে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ছায়াপাত খুব স্পষ্ট। সেকালের বাঙালি পরিবার ছিল একান্নবর্তী। পারিবারিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সেখানে যে নিবিড় টান অনুভব করা যেত, কৃত্তিবাসের লেখায় এর প্রতিফলন ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। রাম-লক্ষ্মণের সৌভ্রাতৃত্ব, দশরথের প্রতি রামচন্দ্রের শ্রদ্ধা, বিমাতাদের প্রতি ভক্তি, ভরতের অগ্রজকে সম্মানদান, সীতার সর্বংসহ দুঃখময় বধূজীবন, হনুমানের দাস্যভাব সবই যেন বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রত্যক্ষিক সত্য। এমনকি এটাও ভাবা চলে যে, সেকালের বহুবিবাহজনিত সপত্নীপ্রথাও রূপায়িত হয়েছে কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রার জীবনাচরণে। সর্বভারতীয় চরিত্রগুলির এইরূপ আঞ্চলিক রূপপ্রাপ্তি একদিকে যেমন অনুবাদকের ক্ষীণশক্তির পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে দীর্ঘকাল ধরে পাঠকসমাজে বেঁচে থাকার গূঢ় রহস্য। মহাকাব্যে যদি একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচেতনার ফসল হয়, তাহলে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালির সমূহ জীববোধ যেভাবে উপস্থাপিত তাতে একে জাতীয় মহাকাব্যের সম্মান দেওয়া চলে। জাতির আত্মপ্রতিবিম্বনই হয়তো কবির লক্ষ্য ছিল এবং সেদিক থেকে তাঁর সফলতা প্রশ্নাতীত। এইভাবে স্বকীয়তার উপস্থাপনায় বামপাঁচালি বাল্মীকির মহৎ সৃষ্টির সমান্তরাল এক স্বতন্ত্র বঙ্গীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

বস্তুত পক্ষে কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রে, আখ্যানে, পরিবেশ বর্ণনায়, সামাজিকতায়, নিসর্গ প্রকৃতিতে, দৈনন্দিন জীবনচর্যায় বাঙালিত্বের ও বাংলাদেশের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করা যায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করা যাক।

প্রথমত, চরিত্রগুলি সবই কমবেশি বাঙালি-প্রাণের রসে সঞ্জীবিত। ঘরোয়া আদর্শের ছাঁচে এগুলি তৈরি হওয়ায় পাঠক রামায়ণের গল্পকে বাইরের কাহিনী বলে মনে করার অবকাশ খুঁজে পায় না। বাঙালি বীরের শৌর্য ও দুর্বলতা দিয়ে রামচরিত্র তৈরি। তিনি পত্নীপ্রেমে দুর্বল এবং স্নেহে, মমতায় ও কোমলতায় সজল। সীতা বাঙালি গৃহবধূর মতো নতমুখী, সহিষ্ণু ও স্বামী-অনুগতা। রাবণকে মনে হতে পারে বাংলার দুর্বত্ত কোন জমিদার। কবি মুনিঋষিদের নির্মাণে পেটুক বামুন ঠাকুরদেরকেই আদল করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিকতার ক্ষেত্রে কবির আদর্শ বাংলাদেশের সমাজ। বাল্মীকিতে নেই এমন ঘটনাও কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন কেবল বাঙালি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। যেমন, বনবাস যাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্রকে বিমাতা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করে যাত্রার অনুমতি ভিক্ষা করতে দেখা যায়, যা মূলে অনুপস্থিত। অরণ্যকাণ্ডে বিদেহী দশরথের অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে সীতার বালির পিণ্ডদান সমধর্মী আর একটি বিষয়। নির্দোষ ভরত রামের বনগমনের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে তার জননী কৈকেয়ী ও দুষ্ট পরামর্শদাত্রী মন্থরার সঙ্গে যে আচরণ করে তা অনেকাংশে বাঙালি যুবকের চরিত্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। লক্ষ্মণের ঔদ্ধত্য ও গোঁয়ার স্বভাব কবি তাঁর সমাজ থেকেই আহরণ করেছিলেন বলে মনে করি। বাঙালির আবেগপ্রবণতা, কোমলতা, দার্ঢ্য পরশ্রীকাতরতা তাঁর কাব্যে এভাবে নানা দিকে থেকে বাঙালিত্বের মুদ্রাচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক কৃত্তিবাস অবিকল তুলে ধরেছেন। যেমন, রামচন্দ্রের জন্মকেন্দ্রিক নানা আচার-অনুষ্ঠান (পাঁচুটি, ষষ্ঠীপূজা, অষ্টকলাই, নত্তা, জননাশৌচান্ত, অন্নপ্রাশন), পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি বর্ণনা আছে কাব্যে। রাজ্যাভিষেকের পূর্বদিন রাত্রে রাম ও সীতা সংযম অবলম্ভবনপূর্বক উপবাসী থাকেন। পুত্রের মঙ্গলকামনায় কৌশল্যা শিবের পূজোয় রত হন। দশরথ ও রাবণের অন্ত্যেষ্ঠি সংস্কার বাঙালি হিন্দুর মতো।

চতুর্থত, বঙ্গদেশের বিবিধ স্থাননামের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস অযোধ্যার কাহিনীকে রাসরি বাংলার মাটিতে নামিয়ে এনেছে। গঙ্গা অবতরণের প্রসঙ্গে তিনি নদীয়া, নবদ্বীপ, মেড়াতলা, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশের কথা লিখেছেন, যেগুলি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল।

পঞ্চমত, বাঙালির খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপক উল্লেখ মেলে কৃত্তিবাসের পাঁচালিতে। রামচন্দ্রের অন্বেষণে বহির্গত ভরতকে নারিকেল, কলা, আম, কাঁঠাল, দুধ, দই, কইমাছ, চিতলমাছ ইত্যাদি বাঙালির অভ্যস্ত খাদ্যসামগ্রী দিয়ে অভ্যর্থনা করে গুহক চণ্ডাল। ভরতের আহারের জন্য ভরদ্বাজমুনিও যেসব পিঠে পায়সের ব্যবস্থা করেন বাঙালির রসনায় তারা চির আস্বাদিত হয়ে এসেছে। কবির বর্ণনায় মেলে—'চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সামলী। সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি ৷৷' কবি বানর বাহিনীকে মানবীয় আকার দিয়েই এঁকেছেন। ফলে তাদের ভোজন দ্রব্যও বাঙালির ন্যায়। তারা খায় লুচি, কচুরি, ছানাবড়া, ছানাভাজা, জিলাপি, মণ্ডা, মতিচুর, রসকরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠা, পাঁপড়, পায়েস ইত্যাদি ভক্ষ্যদ্রব্য। বাঙালির পাকশালার বর্ণনা পাওয়া যায় উত্তরকাণ্ডে সীতার রন্ধনে। তিনি দীর্ঘকাল অভুক্ত দেবর লক্ষ্মণকে দুর্দান্ত সব ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করেছেন। একটু উঁকি দেওয়া যাক সীতার রন্ধনশালে—'প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ। তার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ ৷৷ ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাল ব্যঞ্জন। ....শেষে অম্বলান্তে হল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।'

সবশেষে নিসর্গবর্ণনার কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের সজলাশ্যামলা প্রকৃতি রামায়ণে উপস্থিত। পশুপাখিরা বর্ণনায় বাংলার জীবজন্তু ও পাখিরা খুব বর্ণবন্ত। সারস, কাদাখোঁচা, শকুন, কোকিল, চিল, কালপেঁচা, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, হরিতাল, পায়রা, বাজপাখি, বাদুড়, বক, টিয়া, চামচিকি, কাঠঠোকরা—কার নাম না উল্লেখ করেছেন কবি। বোঝা যায় কবি বঙ্গদেশের জীবনধর্ম ও পরিবেশের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে এ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে অত্যন্ত যথার্থ মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মূল রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া বাঙালির হাতে রামায়ণ স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বাংলা মকাকাব্যে

বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালি সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।' কৃত্তিবাসী রামায়ণে পরিস্ফুট বাঙালিয়ানা সম্পর্কে এটাই সারকথা, শেষকথা।

৫.৩ ভাগবত অনুবাদের ধারা

বেদ-উপনিষদাদির পর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যে-জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা সুবিপুল সেগুলি হল পুরাণ। পুরাণগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কৃষ্ণকথাকেন্দ্রিক পূরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। পণ্ডিতগণের মতে, পুরাণগুলির জন্ম হয়েছিল কোন বিশেষ ধর্মনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়ে। বলা হয়ে থাকে, নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের অভিঘাতে বৈদিক ধর্মের যে নবরূপান্তর ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ আছে পুরাণে। এই হিসাবে সংস্কৃত লেখা ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণের জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পর। পুরাণে পৌরাণিক দেবতাদেরই জয়জয়কার। প্রতিটি পুরাণে পাঁচটি লক্ষণ আবশ্যিকভাবে লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত। পৌরাণিক দেবতারাই পরবর্তীকালের ধর্মবিশ্বাসে জাঁকিয়ে বসেছেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে পৌরাণিক সংস্কৃতিরই আধিপত্য দেখা যায়। পুরাণে, বলাবাহুল্য, কাব্যরস কম, তার পরিবর্তে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গল্পকথা, পূজার্চনাবিধি, প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস এবং প্রচুর পরিমাণে ধর্মতত্ত্ব বা দার্শনিকতা। তাই পুরাণের আবেদন রামায়ণ-মহাভারতের মতো রসপরতান্ত্রিক নয়। পুরাণ থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক চূর্ণসূত্র মেলে। মোট ছত্রিশটি পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণের প্রভাব জনজীবনে সবচেয়ে বেশি। কারণ এ পুরাণে বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় বিষ্ণু তথা তাঁর অবতার কৃষ্ণের জীবনকথা ও বাণী লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে এই পুরাণ প্রধান ধর্মগ্রন্থ রূপে বিবেচিত। ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম প্রচারে ভাগবতের ভূমিকা অসামান্য। চৈতন্যোত্তর যুগে তো বটেই, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও যে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে ভাগবতের সুবিপুল জনপ্রিয়তা ছিল তার প্রমাণ এই গ্রন্থের অনুবাদে দৃষ্ট হয়। ভাগবতকে কেন্দ্র করে কবি জয়দেবই প্রথম বড়মাপের কৃষ্ণকথাকাব্য গীতিপ্রবন্ধে লেখেন। কিন্তু তার ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যান প্রথম লেখার কৃতিত্ব দাবি করতে পারনে বড়ু চণ্ডীদাস। তবে তাঁর কাব্যের প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে পৌরাণিক ছিল না। তিনি কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তিটিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর প্রেমিক তথা কাম বিহ্বল মূর্তিটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এর পিছনে বোধ হয় লোকরুচির আনুগত্যটাই ছিল প্রধান প্রণোদনা। তিনি ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে কৃষ্ণের জীবনের কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখলেও তাকে অনুবাদগ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত করা চলে না। তিনি তা দাবিও করেননি। তাছাড়া অনুবাদ সাহিত্যের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল 'লোক নিস্তারণ'। বড়ু সে আদর্শের ধারে-কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করেননি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে মালাধর বসুই সর্বপ্রথম ভাগবতকে মূলে অনেকটা আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ঐ কালপর্বের ভাগবতীয় কৃষ্ণকথার সেরা অনুবাদ। পরবর্তীকালের কবিরা মালাধরকেই আদর্শ ধরে এগিয়ে ছিলেন, যদিও অনুবর্তীদের রচনায় প্রেমভক্তিবাদের ব্যাপক প্রভাব সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

৫.৩.১ মালাধরের ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল

মধ্যযুগের অধিকাংশ কবির ব্যক্তি-পরিচয় অজ্ঞাত। মালাধর সম্পর্কে যতটুকু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা করা চলে। কবির নিজের দেওয়া বিবরণটি এইরকম—'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিনেল প্রভু ব্যাস ॥ তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন ৷৷' কবির কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে নাকি গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। কাব্যে কবির স্বীকারোক্তি—'গুণ নাই অধম মুই নাই কোন জ্ঞান। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ৷৷' গ্রন্থ রচনার সময়ও নির্দেশ করেছেন কাব্য মধ্যে—'তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন ৷৷' কবির জন্মস্থান কুলীনগ্রামে তাঁর কুলপরিচয় সংগ্রহ করতে যান কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ। তা থেকেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য মেলে। সবদিক মিলিয়ে মালাধর সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বিবৃত করা গেল। মালাধর বসুর জন্ম বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কিংবদন্তি অনুসারে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন। তাঁদের সাথে আসেন পাঁচ কুলীন কায়স্থও, যাঁদের মধ্যে অন্যতম দশরথ বসু। মালাধর সেই আদি কায়স্থের ত্রয়োদশ পুরুষ। কবির জন্মসন জানা যায়নি। তবে অন্যবিধ প্রমাণে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বলে অনুমান করা হয়েছে। কবির পুত্র সত্যরাজ খান। এঁর পুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন বলে কথিত। কেউ কেউ আবার সত্যরাজ ও রামানন্দকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। কবির শিক্ষাদীক্ষার কথা কিছু জানা যায় না। তবে যেমন বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তাতে তাঁকে যথেষ্ট পণ্ডিত বলেই মনে হয়। কবি তাঁর কাব্য শুরু করেন ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। শেষ হয় ১৪০২ শ অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি এক গৌড়রাজের কথা উল্লেখ করেছেন, নাম নির্দেশ করেননি। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, ১৪৭৩ সালে নাগাদ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ্। ইনি বিদ্যানুরাগী, গুণীর সমজদার ও হিন্দুধর্মের প্রতি অনকূল ছিলেন। রুকনুদ্দিন রাজত্ব করেন ১৪৫৯-৭৪ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তী প্রশাসক ছিলেন সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্। তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহে। সেজন্য অনেকেই সঙ্গতভাবে অনুমান করেছেন যে, কবির 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন সুলতান রুকনুদ্দিন। কবির পুত্রের নাম 'সত্যরাজ খান'। এটি কি প্রকৃত নাম না উপাধি বিশেষ? কেউ কেউ বলেন, মালাধরের পুত্র লক্ষ্মীধর বসুই এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাপ্রবু রামানন্দ বসুকে খুব প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কারণ তাঁর বংশের গুণী, কৃতী মলাধর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাগবতীয় ভক্তিরসের স্নিগ্ধ প্রস্রবণে সমগ্র বাঙালিকে আপ্লুত করে ভক্তিধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বিনয়োক্তিটি ছিল এইরকম—'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর ৷৷' রামানন্দকে যে মহাপ্রভু কতটা সম্মান দিতেন তার প্রমাণ মেলে রথযাত্রার সময় নীলাচলে প্রতি বৎসর পট্টডোরী আনবার অনুরোধে।

৫.৪.২ অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব

সংস্কৃত ভাবগত একটি সুবিশাল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট ১২টি স্কন্ধ আছে। অধ্যায় আছে ৩৩৫টি এবং শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। ভাগবতের রচয়িতা কে এ নিয়ে সংশয় বর্তমান। কথিত আছে যে, মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণগুলির স্রষ্টা। পদ্মপুরাণে উক্ত হয়েছে, সতেরটি পুরাণ রচনা করে তার সারৎসার শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব ভাগবত রচনা করেন। ভাগবতে কৃষ্ণকথা প্রাধান্য পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এ গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয়েছে। অনুমতি হয়, ভক্তিধর্মের প্রধানকেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে ভাগবতের জন্ম হয়। সেখানকার ভক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা মাধবেন্দ্র পুরী পূর্ব ও উত্তর ভারতে ভাগবত প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধগুলিতে অবশ্য কৃষ্ণকথা নেই। এর দশম স্কন্ধের ৯০টি অধ্যায়ে এবং একাদশ স্কন্ধের ৩১টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম, বিংশ ও একবিংশ—এই তিনটি অধ্যায়ে কৃষ্ণের জীবন উপস্থাপিত হয়েছে। মালাধর এই দশম ও একাদশ স্কন্ধকে অবলম্বন করে অনুবাদে অগ্রসর হন। তাঁর অনুবাদের লক্ষ্য ছিল 'লোক নিস্তারণ' অর্থাৎ জনশিক্ষা।

ভাগবতের কাহিনীর বাইরেও মালাধর পদচারণা করেছেন। অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণকথায় সেখানে প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় কিছু পেয়েছেন, কাব্যে তাকে ঠাঁই দিয়েছেন। তবে ভাগবতের প্রেমিক কৃষ্ণকে সেভাবে উপস্থিত করেননি তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ঐশ্বর্য গুণান্বিত কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন। এটা ঘটনা যে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির আদর্শ প্রচারের পূর্বে বৈধীভক্তির প্রাবল্যে সমস্ত দেশ ভেসে গিয়েছিল। মালাধর তাঁর সময়ের ভাবনায় আবদ্ধ ছিলেন। তবে তিনিই মধুর পন্থার ভজন সম্পর্কে সম্যক্ অবগত ছিলেন, যার স্মারক 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই বাক্য। এই প্রেমময় বাক্যে মধুর ভজনের সংকেত পেয়ে উল্লসিত মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ'। মহাপ্রভুর প্রশংসাধনা মালাধরের কাব্য এর পর থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। আমরা এখন কাব্যটির নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

৫.৩.৩ অনুবাদে মূলানুগত্য

মালাধর দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনীসূত্র অবলম্বনে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত ঘটনা আছে মূল ভাগবতে। একাদশ স্কন্ধে মেলে যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনী। অবশিষ্টাংশে কৃষ্ণ-উদ্ধবের কথোপকথনে মুক্তি, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি, যতিধর্ম ইত্যাদি তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। মালাধর এই দুই স্কন্ধের মূল কাহিনী-কাঠামো এবং কিছু তত্ত্বাংশ তাঁর অনুবাদে অনুসরণ করেছেন। এছাড়া তিনি হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের কিছু কিছু আখ্যান গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যটিতে। মালাধর যে মূল ভাগবতের সব কটি স্কন্ধ তাঁর কাহিনীতে গ্রহণ করেননি, এতে তাঁর সহজাত পরিমিতিবোধ প্রমাণিত হয়েছে। আসলে অনুবাদ করতে গিয়েও কবি সবসময় নজর রেখেছেন কৃষ্ণকেন্দ্রিক নিটোল একটি গল্পের দিকে। সেটি যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্য প্রয়োজনে অন্য উৎসের কাছে হাতও পেতেছেন। তত্ত্বকথা যতটা সম্ভব বর্জন করেছেন। তাঁর রচনাটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড তিনটিতে কাহিনীসজ্জার ক্রমটি এইরকম :

১. আদ্যকাহিনী (বৃন্দাবন লীলা) : এখানে কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িতা বসুমতীর ক্রন্দনপূর্ণ অভিযোগ থেকে কৃষ্ণের জন্ম-অঙ্গীকার, জন্ম, বাল্যলীলা, পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ থেকে রাসলীলা ও শেষ পর্যন্ত বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

২. মধ্যকাহিনী (মথুরালীলা) : এই পর্বে কংস নিধন, কুব্জা-সংবাদ থেকে শুরু করে উগ্রসেনের সেবক হয়ে কৃষ্ণের প্রজাপালন, পরে মথুরা ত্যাগ এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে জলদুর্গের মধ্যে দ্বারকাপুরী স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ-বলরাম মন্ত্রণা পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা আছে।

৩. অন্ত্যকাহিনী (দ্বারকালীলা) : এখানে বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় আশ্রয় গ্রহণ, বলরাম-রেবতী বিবাহ, বসুদেব যজ্ঞ, সুভদ্রাহরণ থেকে শুরু করে ঋষিদের অভিশাপ, উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দ্বারকাপুরী ধ্বংস, যদুবংশ বিনাশ, জরাব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মালাধর বসু যে নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী ভাগবতীয় কৃষ্ণকথাকে কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো বিস্তৃত, আবার কখনো বা পুরোপুরি বর্জন করেছেন, তা তাঁর অনুবাদের ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে। ভাগবতে যেখানে কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলা তথা গোচারণ প্রসঙ্গ দুটি অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, কবি সেখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এটি তুলে ধরেছেন। বরং বেশি কলম বুলিয়েছেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশক অংশে। কৃষ্ণ যখন মথুরায় চলে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সে অংশে ভাগবতে গোপীদের ক্রন্দন বেশ বড় জায়গা নিয়েছে। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। একই প্রবণতা দেখা যায় শাল্ববধের বিবরণেও। মালাধর এখানেও বিস্তৃত কাহিনীকে সংক্ষেপ করেছেন। কবি অভিনবত্ব সঞ্চারের জন্য অথবা কোন কারণে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন বা অন্যতর বিন্যাসও ঘটিয়েছেন। যেমন, ক্রুদ্ধ কংস যখন মহামায়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাথরে নিক্ষেপ করলেন, তখন কবির মহামায়া জানান কংসকে হত্যা করার জন্য যিনি আসবেন তিনি গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে এভাবে স্থাননির্দেশ করা হয়নি। মালাধরের নিজস্ব কল্পনা যুক্ত হয়েছে স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনাতেও। নাটকীয়তা সৃষ্টি জন্য কবি ঘটনার ক্রম কোথাও কোথাও উল্টে দিয়েছেন। যেমন ভাগবতে আছে কালযবন বধের পর জরাসন্ধের মথুরাপুরী আক্রমণের ঘটনা। মালাধর পুরী আক্রমণের ব্যাপারটি আগে এনেছেন। বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন বলরাম-রেবতীর বিবাহের, মূলে যা ভীষণ সংক্ষিপ্ত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনায় কবি কেবল ভাগবতের উপর নির্ভর করেননি। তিনি গল্পের ও চমৎকারিত্বের প্রয়োজনে গীতা, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যেরও দ্বারস্থ। দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক। নবজাত কৃষ্ণকে নিয়ে যখন বসুদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন তখন এক শৃগালী তাঁকে পথ দেখায়। কবির দেওয়া এ তথ্য ভাগবতের নয়, ভবিষ্যপুরাণের। উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শন তো প্রত্যক্ষভাবে গীতার প্রভাব। মহাভারত থেকে সংযুক্ত হয়েছে সুভদ্রাহরণের কাহিনী। পারিজাত হরণের কাহিনীকে বিশদ করে বলতে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে আখ্যান গ্রহণ করেছেন কবি। মহাভারতের গল্প অনুসরণ করেন জরাসন্ধ ও শিশুপালের জন্মকাহিনীতে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের আলোচনায় অনেকে মনে করেন যে, নৌকালীলা, দানলীলার অংশগুলি পরবর্তীকালে এ কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অর্বাচীন পুথিতে রাধার পাশাপাশি ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের উল্লেখও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের প্রক্ষেপ। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই অংশের পিছনে সেদিনের সর্বভারতীয় ভক্তিবাদী প্রবণতাই কাজ করে গিয়েছিল। অবশ্য এটা ঘটনা যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে-ভক্তিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি নয়, তা ভগাবতে বর্ণিত বৈধী ভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনুবাদে আরো একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেটি হল, এই রকম বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাবাশ্রিত কাব্যে শাক্ত প্রভাবের অজস্র নিদর্শন। যেমন—স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনায় রুক্মিণী দেবকীকে বলেছেন, 'পূজ দেবী চণ্ডিকা ভবানী।' নরকাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় বন্দিনী রাজকুমারীরা ঘট পেতে মহেশ্বরীর 'পূজার সংবাদ দিয়েছেন মালাধর—যা মূল ভাগবতে নেই। রাসমণ্ডলে গোপিনী পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের বর্ণনায় কবি তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার করেছেন। উদ্ধবের কাছে কর্মযোগের তত্ত্ব বলার সময় কবি তন্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনার জন্য যোগবাশিষ্ট, গেরণ্ড সংহিতা, লিঙ্গপুরাণ, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই ব্যাপক শাক্তপ্রভাব বাংলাদেশের মূল ধাতু ধর্ম্মকেই প্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব কাব্য রচনা করতে গিয়েও মালাধর তাই শক্তি সাধনার বিশেষ প্রকরণকে তাঁর কাব্যে বর্জন করতে পারেননি। পরবর্তীকালের কৃষ্ণকথা সাহিত্যে তন্ত্রনির্ভর যে শাখাটি লক্ষ্য করা যায় তার পূর্বসূচনা মালাধরের কাব্যেই—এ মন্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।' যাইহোক, অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি যে অনেক স্বাধীনতা নিয়েছিলেন সেটা বোঝা যাচ্ছে ভাগবত-বহির্ভূত প্রসঙ্গ সংযুক্তিতে। আক্ষরিক অনুবাদে যে-ধরনের যান্ত্রিকতা দেখা যায় কবির রচনা তার থেকে মুক্ত। তবে রচনাসৌকর্যের

দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রামায়ণের মতো সুললিত হতে পারেনি। যেখানে তাঁর স্বকীয়তা প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে রচনা কল্পনাশক্তির পরশমণিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একজন জীবনসচেতন শিল্পীর দেখা মেলে সমগ্র অনুবাদ কর্মটিতে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে সাহিত্য ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'এই কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যাবে, মালাধর যতটা নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে ভাগবতের কাহিনী অনুসরণ করেছেন, সে যুগের আর কোনো কবি ততটা ঐকান্তিকতা দেখাতে পারেননি। দু'একটি প্রসঙ্গ বাদ দিলে কবি মূল কাহিনীকে যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন, তাতে কোন সংশয় নেই।'

৫.৩.৪ ভক্তিবাদ-প্রসঙ্গ

মালাধরের কাব্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তির একটি বিশিষ্ট দিক উপস্থাপিত। চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগে ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা প্রচলিত থাকলেও অহৈতুকী প্রেমভক্তির ধারণা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তিকে ঘিরে বৈধী ভক্তির প্রবল প্রতিষ্ঠা সর্বত্র বিরাজমান ছিল। মালাধর তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। এছাড়া কাব্যটি 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' ও 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামেও অভিহিত হয়েছ। 'বিজয়' শব্দটি এখানে কৃষ্ণের কীর্তিকথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামে কবি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি অনেকাংশে পরিষ্কার হয়ে গেছে। গ্রন্থটি যে রসাস্বাদনের চাইতে ভক্তির সূত্রে পুণ্যার্জনের পথেই অনেক সাহায্য করবে কবির প্রাক্-ভাষণ থেকে সেটা বোঝা যায়। কবি লেখেন—'গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার। শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥' এই প্রসঙ্গে একথা ভাবা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাক্-চৈতন্য পর্বে মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী প্রমুখ ভক্তিপথের সাধকগণ বাংলাদেশে যে-ভক্তিবাদী ভাবনার সূচনা করেছিলেন, জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলিতে যে-কৃষ্ণকথা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল বিদগ্ধ সমাজে, তার দ্বারা কোনভাবে উদ্দীপিত হয়ে মালাধর অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তি থাকা সত্ত্বেও কবি কেন তাঁর অনুবাদে সেদিকটিকে প্রাধান্য দিলেন না তা অনুধাবনযোগ্য। অনেকে এই ক্ষেত্রে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে দায়ি করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসলমান প্রশাসকদের অত্যাচার ও ইসলামধর্মের আক্রমণে নির্জিত হিন্দুসমাজে যে বলিষ্ঠ ও বীর্যবান মানুষের আবির্ভাব ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছিল, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সেই ঐশ্বর্য ও প্রতাপের মূর্তিমান বিগ্রহ। একটু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষ্ণ যেন জাতীয় বীরের প্রতিমূর্তি। তাই কৃষ্ণকেন্দ্রিক গল্পে আদিরসের স্থলে ঐশ্বর্যগণের প্রাধান্য। আবার কারও মতে, কবির পৃষ্ঠপোষক রাজসভার ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাব তাঁর উপর পড়ায় কৃষ্ণের মধুর ভাবাশ্রিত গোপীজনবল্লভীয় প্রেমরসের তুলনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে তাঁর দেবত্ব ও শাস্ত্রীয় মহিমা। তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে, যে-ভাগবত কবির অনুবাদের আদর্শ তাতে ঐশ্বর্যমিশ্রিত কৃষ্ণলীলারই প্রাধান্য। ফলে মালাধরের কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে বৈধীভক্তির প্রথাসিদ্ধ রূপটি দুকূলপ্লাবী আত্মনিবেদনের ভাবোচ্ছ্বাস সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট একটি চরণকে ('নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ') মহাপ্রভু তাঁর দার্শনিক ভাবনার দিক থেকে খুবই মূল্যবান বলে মনে করতেন। এই কাব্যপংক্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে রাগানুগা সাধনার মূল ভাবনাটি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত শ্রীচৈতন্যের উক্তিটির জন্য বৈষ্ণব সমাজে ইহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। তাহা না হইলে ভাগবতের ঐশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মাধুর্যভাবের সাক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট কিরূপ বোধ হইত, তাহা সংশয়ের

বিষয়।’

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্তাই যে কবির অন্যতমত লক্ষ্য ছিল, তার কিছু কাব্যগত প্রমাণ এখানে দাখিল করা যেতে পারে। ব্রজলীলার মধ্যে কৃষ্ণ কয়েকটি অসুর বধ করেছিলেন। এর বর্ণনাতে কবির কলম যেন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা ভাগবতে নেই, কিন্তু মালাধরের কাব্যে আছে। বীররসের বর্ণনায় কবি খুব স্বচ্ছন্দ। অবিষ্টাসুরের বর্ণনা এর অন্যতম। কৃষ্ণ যেভাবে অবলীলায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেছেন, তাতে কবির অনন্ত শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাবাত্মক রূপটি খুব স্পষ্টমাত্রায় ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, জয়দেবের পরে মালাধর আইবর্ভূত হলেও তাঁর কাব্যে কোথাও কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধার নাম উল্লেখ করেন না।

৫.৩.৫ বাঙালিয়ানা ও কবির কবিত্ব

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাব্যমূল্য বিচারে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যা বাঙালির জীবনাচরণ ও ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ, করার ফলে মালাধরের মধ্যে সংগুপ্ত হয়েছিল। কবি মূলের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও বাঙালি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কোথাও কোথাও। ভাগবতের পটভূমি মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকা। সেখানকার নিসর্গপ্রকৃতি, জনজীবন কিংবা লোকাচার বাংলাদেশের তুলনায় অবশ্যই আলাদা। অথচ কবি এমন ভাবে কাহিনী বর্ণনা করেন যাতে পাঠক এই সত্য বিস্মৃত হয়ে নিজের চারপাশের প্রতিবেশকে তাঁর মনের পর্দায় দেখতে পান। জননী যশোদা ও বাঙালি ঘরের মায়ের মধ্যে আমরা কোন পারিবেশিক ভেদ খুঁজে পাই না, যখন তিনি পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেন, “আইস বাপু বলরাম কানাঞিত লইয়া। ভাত খ্যায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া ॥’ অঘাসুর বধের পর কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত বালকদের খাদ্য বণ্টন করেছেন এ চিত্রও নিতান্ত বাংলাদেশের। কাব্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা ভাত খাওয়ার এইসব সংবাদ কি বাংলার খদ্যাভ্যাসকেই স্মরণ করায় না?

খাদ্যাভ্যাস ছাড়া কাব্যে মেলে বাংলাদেশের অতি পরিচিত বৃক্ষাদির বর্ণনা। কবি মথুরার রস্তার ধারে গুয়া, জলপাই, কামরাঙার গাছ দেখতে পেয়েছেন, বৃন্দাবনের বনে রয়েছে তাল, তমাল, আমলকী, বাসক, পাকুড়, পলাশ প্রভতি গাছ। আবার কবি যখন কৃষ্ণের জন্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন, ‘পুত্রের জনম দিনে/কাজর দিলা নয়নে/শূন্য ঘরে আছেন শ্রীহরি’ তখন একান্ত বাংলারই এক সদ্যোজাত শিশুর চিত্র ফুটে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের প্রসঙ্গে যশোদা যখন বলেন, ‘মিথ্যা না দুসিয় পুত্রখানি’ তখন বাংলাদেশের মাতৃহৃদয়ের অভিমানই রূপ পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি বাংলার বর্ণবিভাজন, ফুল, ফল, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি—সব কিছুই কাব্যক্ষেত্রে উঠে আসে। কবির উপমা চয়নেও বঙ্গদেশের অনুষঙ্গ উপস্থিত। কৃষ্ণ যখন কেশী দানবের দেহ বিদীর্ণ করে মাটিতে ফেললেন, তার বর্ণনায় কবি লেখেন, ‘ফুটি কাঁকুড়ি যে হৈল খান খান’। এতো একান্তভাবে বাংলাদেশেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা সজাত।

মালাধরের কবিত্বের আলোচনায় অনেকেই হত্যাশাব্যঞ্জক উক্তি প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁদের ভাবনায় অগোচরে কাজ করে গেছে কবি কৃত্তিবাসের সিদ্ধি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলা প্রয়োজন যে, রামায়ণ কিংবা মহাভারতের গল্প সাধারণ্যে যতটা পরিচিত ভাগবতের কাহিনী ততটা নয়। সেদিক থেকে জনপ্রিয়তায় ঐ দুই মহাকাব্যের গল্পের কাছে ভাগবত দাঁড়াতে পারে না। এইরকম আপেক্ষিক দুর্বল স্থানে দাঁড়িয়ে মালাধরের যাত্রাসূচনা হয়েছিল। ফলে জনপ্রিয়তার নিরিখ দিয়ে তাঁর কাব্যের সিদ্ধি ব্যাখ্যা করাটা অনুচিত। অন্যদিকে, কাব্যরচনায় তাঁর মুখ্য অভিপ্রায় ছিল লোক-নিস্তারণ। ফলে বিশুদ্ধ কবিত্বের জন্য কবিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর ছিল না। আর তাছাড়া

'কবিত্ব' শব্দের অর্থ যদি হয় দ্যুলোক-ভূলোক সঞ্চারী কল্পনাশক্তির ক্রিয়া তাহলে বলতে হবে মালাধর কেন কোন অনুবাদকের সেই ক্ষমতা প্রকাশ পায়নি তাঁদের সৃষ্টিতে। বরং কবিত্বের অর্থকে সংকীর্ণ করে যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে কাব্যটিতে কবি একটি পূর্বকথিত গল্পের নিটোল ভাষান্তর ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'কাহিনী বয়নে যেমন তিনি মাঝে মাঝে মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তেমনি বর্ণন সৌকর্যে ও অনুভূতি প্রকাশের আন্তরিকতায় কখনও তাঁর কাব্য প্রাণময় হয়ে উঠেছে।' বর্ণনার সৌকুমার্য ফুটেছে যশোদার গর্ভ থেকে যোগমায়ার জন্মের মুহূর্তটিতে—'উঙা উঙা করিয়া কান্দএ কন্যাখানি। চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি ॥' এছাড়া কৃষ্ণপ্রেমতদ্গত গোপীদের চিত্রাঙ্কণে কোমলভক্তি নিস্নাত মাধুর্যের স্পর্শ মিলবে কৃষ্ণের চারপাশে ভীড় করে আসা গৃহত্যগিনী গোপিনীদের বর্ণনায়—'এতেক বিপ্রিয় যবে গোবিন্দ বলিল। হেট মাথা করি গোপী কাঁদিতে লাগিল ॥ স্তন বাহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে। বসন মলিন হৈল নয়ানের জলে ॥' কৃষ্ণের বংশীনাদে জীব ও জড় জগতের যে আনন্দিত প্রতিক্রিয়া কবি বর্ণনা করেন তার কবিত্ব মূল ভাগবতকে বোধ হয় ছাপিয়ে গিয়েছে। এর এক ঝলক—'কদম্বের তলে জবে বংসি নাদ দিল। তা শুনি ময়ূর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥ সুখান জতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে। বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগণে ॥' মথুরাগামী কৃষ্ণের সংবাদ বন্দাবনে প্রচারিত হলে সমস্ত গোপিনীরা যে-ভাষায় বিলাপ করতে থাকে তার আবেগ ও আন্তরিকতা সত্যই অপূর্ব সঙ্গীতধর্মে কাব্যমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—

> 'আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
> আলিঙ্গন না করিব দেব দামোদরে ॥
>
> আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
> আর না করিব সখী সে মুখ চুম্ববন ॥
>
> আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
> আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥
>
> কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
> কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
>
> অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
> কান হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥

তবে কবিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অলংকার ও ছন্দ-প্রয়োগে তিনি সৃজনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর ব্যবহৃত অধিকাংশ অলংকার গতানুগতিক ও ভাগবত অনুসারী। যেমন—'পূর্ণিমার চান্দ জিনি বদলকমল। খঞ্জন জিনিএগ সোভে নয়ান যুগল ॥' অবশ্য এরই ফাঁকে কোথাও কোথাও বাঙালি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কবি অলংকার নির্মাণের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন—পুতনার বর্ণনায়, 'লাঙ্গলের ঈষ যেন দন্ত সারি সারি। গিরিসম কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ॥' তাঁর কলমে মূর্ছিতা রুক্মিনী—'কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝরে।' সব শেষকথা এই যে, বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ম ধর্মের উত্তাল তরঙ্গ জেগে ওঠবার বেশ কিছু সময় আগে মালাধর প্রায় অপরিচিত কৃষ্ণকথাকে সাধারণের ভোগ্য এক সামগ্রীতে পরিণত করেছিলেন। সেখানে তাঁর কেউ দোসর ছিল না, ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বীবও। মনে রাখা জরুরী যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত প্রথম রচনা। এই কাব্যের ধর্মীয় গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে মহাপ্রভু যখন মালাধরের বংশধর বসু রামানন্দকে সশ্রদ্ধায় বলেন, 'তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেও মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥' তখন শ্রীচৈতন্যের এই অভিব্যক্তিই হয়ে ওঠে কাব্যটি সম্পর্কে সবচেয়ে সেরা মূল্যায়ন। মহাপ্রভুর আস্বাদনধন্য গ্রন্থটি তাই চৈতন্যোত্তর কালে নৈষ্টিক বৈষ্মব সমাজে স্থান ককের নিতে বিশেষ বিলম্ব করে না।

৫.৪ মহাভারত অনুবাদের ধারা

রামায়ণের মতো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্বে বিন্যস্ত মহাভারতও ভারতবর্ষের ধর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ। একটি জাতির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সামগ্রিক পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে এই গ্রন্থে। রামায়ণে ছিল দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সংঘাত, আর মহাভারতে আছে একই সংস্কৃতির অভ্যন্তর ভাগের নীতিগত সংঘর্ষ। স্বজনঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পাশব প্রতিহিংসা, আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ বীরত্ব, দেবোপম ক্ষমা ট্র্যাজেডির হাহাকার পর্বে পর্বে বিন্যস্ত করে মহাকাব্যের কাহিনীকার মানবভাগ্যের যে করুণ পরিণতির চিত্র অঙ্কন করেছেন তা কাব্য হিসেবে যেমন অতুলনীয়, তেমনি তা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিভূমিও বটে। মহাকবি বেদব্যাস কুরু পাণ্ডবের কাহিনী বর্ণনার সূত্রে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বিশদ পরিচয় রেখেছেন ভারতকথার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। তাই এ গ্রন্থ একাধারে পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ। আর ধর্মাদি চতুর্বর্গে সন্ধান দেয় বলে মহাভারত 'পঞ্চম বেদ' নামেও কথিত। মহাভারত যেন একটি বিশাল জীবন নাট্যের প্রদর্শন শালা, যার প্রারম্ভিক সূচনায় ভারতকথার উন্মোচন, অগ্রগতির পর্বে জিগীষা ও জিঘাংসার কুটিল ইন্ধন, চরমোন্নতিতে রণরঙ্গমুখর অস্ত্রের ঝনৎকার, অবনয়নে ক্রোধশান্তি ও উপান্তে গৈরিক বৈরাগ্যমণ্ডিত এক গভীর ট্র্যাজিক বেদনা। আয়তনিক বিচারে মহাভারত বিশাল এক গ্রন্থ। আঠারো পর্বে বিন্যস্ত ও লক্ষাধিক শ্লোকে সমাপ্ত। অনেকের ধারণা, মহাভারত-বর্ণিত ঘটনা বাস্তব ও ঐতিহাসিক। আর্যভট্টের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বরাহ-মিহিরের মতো, জ্যোতিষশাস্ত্রে কিংবদন্তিরা মনে করেন প্রায় খ্রি. পূ. ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অনেকগুলি লিখিত প্রমাণের দ্বারা বর্তমানে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, খ্রিঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর মধ্যেই মহাভারত বর্তমানে আকারে গড়ে উঠেছে এবং খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মহাভারতের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর যবদ্বীপ ও কম্বোজে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। আদিপর্বের শ্লোক থেকে অনুমিত হয়, বেদব্যাস ছাড়া তাঁর পঞ্চশিষ্য সুমন্ত, পৈল, জৈমিনী, বৈশম্পায়ন ও শুকদেব (পুত্র) পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা রচনা করেন। তার মধ্যে মহামুনি জৈমিনীর অশ্বমেধপর্বের কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। সপ্তম শতকের মধ্যে যে এই মহাগ্রন্থ শিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মজিজ্ঞাসা ও রসপিপাসাকে তৃপ্ত করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল, সে আভাস পাওয়া যায় বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ। শুধু আর্যাবর্তেই নয়, দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষাতেও মহাভারতের কাহিন সাঙ্গীকরণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদেও হয়েছিল অল্পবিস্তর। বাংলায় এর সূচনা ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে। ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, সুলতান হসেন শাহের কর্মচারী চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সর্বপ্রথম এর চর্চা শুরু হয়। তাঁর পুত্র ছুটি খানের রাজত্বকালেও এ চর্চা অব্যাহত থাকে। এ দুজন কবি চৈতন্য-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর একজন কবির কথা জানিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। তাঁর নাম সঞ্জয়। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে এঁদের সাহিত্যকৃতির আলোচনা তাই পরবর্তী খণ্ডাধ্যায়গুলির বিষয়।

৫.৪.১ কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ইনি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসক (লস্কর) পরাগল খানের আজ্ঞায় কাব্য রচনা করেন। পরাগল ধর্মে মুসলমান হলেও বিদ্যোৎসাহী ও কলারসিক ছিলেন। তিনি হিন্দু পুরাণের গল্প শুনতে ভালবাসতেন, কিন্তু গল্পরস

নিবৃত্তির প্রধান বাধা ছিল সংস্কৃত ভাষা। সেজন্য পৃষ্ঠপোষিত কবি পরমেশ্বরকে নির্দেশ দিলেন ভারত কাহিনী রচনার, যাতে একদিনের মধ্যেই সমগ্র কাব্যটি শুনে উঠতে পারেন। কবি তাঁর ভণিতায় 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস', 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর', 'কবীন্দ্র' প্রভৃতি শব্দকে ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সমালোচক অপর এক মহাভারত অনুবাদক শ্রীকর নন্দীর সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব নির্দেশ করেছেন। কবিদ্বয়ের অভিন্নতা বিষয়ে যাঁর কলম সবচেয়ে বেশি উচ্চকিত, তিনি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই মত সমর্থন করেন শহীদুল্লাহ ও সুশীল কুমার দে। বস্তুত পরাগলী মহাভারতে প্রাপ্ত একটি ভণিতায় 'শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া' চরণটি এঁদের ধারণার মূলে কাজ করেছে। কিন্তু এ মত নানা কারণে মানা যায় না। প্রথমত, আমরা জানি, প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের পুথিসাহিত্য গায়েনদের মুখেই বেঁচে থাকতো। সেক্ষেত্রে গায়েনদের মুখে দুই কবির নাম এক স্থানে চলে আসাটা অসম্ভব কিছু নয়। দ্বিতীয়ত,শ্রীকর-নন্দী'-কে যদি কবির নাম এবং 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর'-কে যদি উপাধি বলে ধরে নিই, তাহলে তা যুক্তি হিসেবে দাঁড়ায় না। 'কবীন্দ্র'-এর সঙ্গে 'পরমেশ্বর' সংযোগের ফলে প্রথমটি উপাধিতে পরিণত হয়েছে। অতএব শ্রীকর নন্দী নাম প্রক্ষেপ মাত্র। তৃতীয়ত, 'শ্রীকর নন্দী' যদি কবির নামই হতো তাহলে ছুটি-খানী মহাভারতে তিনি বার বার ঐ নাম ব্যবহার না করে 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ভণিতা ব্যবহার করতেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত—'অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস' এবং ছুটি-খানী মহাভারতের রচয়িতা 'শ্রীকর নন্দী' ভিন্ন লোক।'

কবন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যের নাম 'পাণ্ডব বিজয়', যদিও পৃষ্ঠপোষকের অনুমতিক্রমে লিখিত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পরাগলী মহাভারত'। এই কাব্যে বাংলার দুইজন শাসকেরক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—হোসেন শাহা ও নসরৎ খান। নসরৎ হোসেনের পুত্র। প্রথম জন রাজত্ব করেন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রি. এবং দ্বিতীয় জন ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। যেহেতু কাব্যের বর্ণনায় দু'জন প্রশাকই উল্লেখিত তাই কবির কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কাব্য শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে যে লস্কর পরাগল কবিকে 'কবীন্দ্র' উপাধি দিয়েছিলেন এটি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু একজন মুসলমান প্রশাসকের হিন্দু কাব্যকাহিনী শোনার এরূপ বাসনার কারণ কি? এক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া পথ নেই। যতদূর মনে হয়, যোদ্ধৃ মনো ভাবের মানুষ ছিলেন পরাগল। অথচ যুদ্ধবিগ্রহমূলক ইসলামী কাহিনীর সাক্ষাৎ বাংলাভাষায় তখনো পাননি। সেজন্য মহাভারতের কূট ষড়যন্ত্র, বিবদমান দুই শক্তির যুদ্ধবিগ্রহ, সৈন্যাপত্য কৌশল এই তুর্কী শাসককে মুগ্ধ করেছিল। সেজন্য তিনি কবিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'এইসব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া। দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালী রচিয়া ॥' কবিও অন্নদাতার মর্জিমাফিক মহাভারতের মূল কাহিনী অনুসরণ করে অতি সংক্ষিপ্ত এক অনুবাদ পেশ করলেন। কবি তাঁর ইচ্ছামতো রচনা কার্যে স্বাধীনতা পাননি বলে রচনাটিতে প্রতিভার বিশেষ কোন ছোঁয়া মেলে না। শিল্পগুণের দিক থেকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা। তবুও এ রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা মহাভারতের মতো দীর্ঘ আয়তনিক কাব্যের অনুবাদ এর আগে সাহস করে করতে কেউ অগ্রসর হননি। কবি সুদূর চট্টগ্রামে বসে এ কাব্য লিখেছিলেন। সেদিক থেকে রাঢ় বঙ্গে লেখা পূর্বসূরীদের কাব্যের কোন আদর্শ পাননি। নিজেকেই ভাষাপথ খনন করে পয়ার-ত্রিপদির চালে কথাকে দুলিয়ে রসগ্রাহী অন্নদাতা প্রভুর মনোরঞ্জন করতে হয়েছে। অনুবাদটির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—১. পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে কবি কোন পল্লবিত বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে মূলকে দৃঢ়বাবে অনসুরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ২. মুসলমান প্রশাসকের জন্য রচিত হলেও কাব্যভাষায় আরবী-ফারসীর বিরল ব্যবহার করেছেন। তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে তৎসম শব্দের প্রয়োগ। ৩.

রাজসভার পাঠের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করলেও সুযোগ থাকা সত্ত্বও কবি উৎকট প্রসাধন বা নাগরিক বিলাসকে প্রশ্রয় দেননি, যা পরবর্তীকালের সভাকাব্যগুলির অন্যতম লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরাগলী মহাভারত তেমন শিল্পগুণান্বিত রচনা নয়। তবে কবির রচনাশৈলীতে যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতার দেখা মেলে। যার ফলে পুরো রচনাটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। যেমন, কবি কৃষ্মের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন—'পরিধান পীতবাস কুসুম বসন। নব মেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন ৷৷' পয়ারের পাশাপাশি ত্রিপদী ব্যবহারে কবি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন—'ক্রুদ্ধ হৈল দুর্যোধন/আদেশিলা দুঃশাসন/ দ্রৌপদী আনহ চুলে ধরি। রাজার আদেশ পাইআ/দুঃশাসন গেল ধাইআ/সভাতে আনিল একেশ্বরী ৷৷' বর্ণনায় নাটকীয়তা ও চিত্ররূপ সৃষ্টির দক্ষতাও ছিল পরমেশ্বরের। যেমন—'যেন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল। ভীষ্ম ধনঞ্জয় দুই মেশামিশি হৈলে ৷৷' মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হিসেবে এ ধরনের সিদ্ধি যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

৫.৪.২ শ্রীকর নন্দী

বাংলা ভাষায় মহাভারতের দ্বিতীয় অনুবাদক শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দীকে পাওয়া গেল ঐ একই রাজসভাতে। এই কবি খুব সম্ভব পরাগলের পুত্র ছুটি খানের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে মহাভারতের বিশেষ এক পর্বের অনুবাদ করেন। কবি কাব্যের সূচনায় লিখছেন, 'লস্কর পরাগল কানের তনয়। সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয় ৷৷' কেউ কেউ ছুটিখানের প্রকৃত নাম নসরৎ খান বলে নির্দেশ করেছেন। আবার এদিকে গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের পুত্রও নসরৎ। তিনি অবশ্য কবির লেখনীতে নসরৎ 'শাহ' বলে উল্লেখিত হয়েছেন। কবির অন্নদাতার প্রভু হিসেবে শ্রীকর নন্দী একই সঙ্গে হুসেন ও নসরৎ শাহের নাম সমস্থানে উল্লেখ করেছেন—'নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা। রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ৷৷ নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি। পঞ্চ গৌড়েত যার পরম যে খ্যাতি ৷৷' পিতা-পুত্রের একত্র নামোল্লেখ থেকে সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকরের অনুবাদটির রচনাকাল ১৫১২ থেকে ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বলে অভিমত দিয়েছেন।

যতদূর মনে হয়, শ্রীকর নন্দীর কাব্য রচনাকালে লস্কর পরাগল জীবিত ছিলেন না। তাঁর পুত্র নসরৎ খান 'ছোট খান' হিসেবে সাধারণ প্রজাবৃন্দের কাছে 'ছুটি খান' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ইনি পিতার মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। তিনি তাঁর পিতার মতোই সুদক্ষ শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। মহাভারতের অনুবাদে তিনিও শ্রীকর নন্দীকে আদেশ দেন—'শুনিব ভারতপোথা অতি পুণ্য কথা। মহামুনি জৈমিনীর পুরাণ-সংহিতা ৷৷ অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়। সভাখণ্ডে আদেশিলা খান মহাশয় ৷৷' আমাদের মনে হয়, ছুটিখান কেবল রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিষয় নির্বাচন করেছিলেন কবি নিজে। শ্রীকর আগের অনুবাদ সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন বলে কাহিনীতে নূতনত্ব সঞ্চারের তাগিদে কেবল জৈমিনী বিরচিত অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন। ঐ পর্বটিতে যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ বীররসের বাহুল্য আছে। মুসলমান সেনাপতির মনোভাব বুঝে যে কবি বিষয় বেছেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যটি রচনায় যে ছুটিখানের অন্য আর এক উদ্দেশ্য ছিল, কবি তারও উল্লেখ করেছেন পোষ্টা প্রভুর উক্তি উদ্ধৃত করে। নসরৎ খান নাকি বলেছিলেন, 'দেশী ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার। সঞ্চারিবে কীর্তি মোর জগৎ সংসার ৷৷' একথা যদি সত্য হয় তাহলে মুঘল-পূর্ব স্বাধীন সুলতান কিংবা প্রশাসকরা যে বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিক দরদ দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তুলনায় শ্রীকর নন্দী যে অনেক স্বাধন ছিলেন তা কাব্যের কাহিনী সূত্রে বলা যায়। মূল মহাকাব্যের একটি মাত্র পর্বকে অনুবাদের জন্য বেছে নেওয়ায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য অনেক নতুন কাহিনী অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সেইসঙ্গে মূলকেও বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছিলেন। যুবনাশ্ব, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ, জনা, প্রমীলা, বভ্রুবাহন, চন্দ্রহাস, হংসধ্বজ, চণ্ডিকা, সুরথ ইত্যাদি উপাখ্যান কবি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কবিত্বের বিচারে কবীন্দ্রকে অতিক্রম করার সামর্থ্য ছিল শ্রীকরের। রচনার যথেষ্ট সরলতা দেখা যায়। রাজসভার কবি হওয়া সত্ত্বেও কবি পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা বর্জন করেছেন। অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীতে বীররসের প্রয়োগ সুপ্রচুর। কবি মূলের রস বজায় রেখেও অনাবিল হাস্যরসের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ভীমের একটি উক্তির কথা স্মরণ করা চলতে পারে। অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গে ভীমের যাওয়ার কথা উঠলে কৃষ্ণ পরিহাস করে বলেন যে, তাঁর মতো স্থূলোদর পেটুকের এ থেকে বিরত থাকা ভালো। তার প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্ত ভীম ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন,

'মোকে মন্দ বল কৃষ্ম নিজ না দেখিল ॥
তোহ্মার উদরে যত বৈসে ত্রিভূবন ।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন ॥
তুমি স্থূলোদর নহ, আমি স্থূলোদর ।
বিমর্ষিয়া চাহ কৃষ্ম দেব দামোদর ॥
সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইলা তুহ্মি ।
তোহ্মা হতে বহু ভক্ষ হইল কি আহ্মি ॥'

এভাবে জৈমিনী ভারতের রসিকতা ও ব্যঙ্গের প্রসঙ্গগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন শ্রীকর নন্দী। কাব্যের বর্ণনা অংশ কবিত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ না হলেও স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত। ছুটি খানের নির্দেশে কাব্যটি রচিত বলে এবং একই রাজসভায় স্বল্পকাল ব্যবধানে দুটি একই ধরনের রচনা সৃষ্টি হয় বলে তাদের পৃথকীকরণের কারণেও শ্রীকর নন্দীর অনুবাদকে অনেকে 'ছুটি খানের মহাভারত' বলেও নির্দেশ করেছেন।

৫.৪.৩ বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়

আদিপর্বের মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে আরো দুটি নাম পণ্ডিত ও গবেষক মহলে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এঁরা হলেন বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়। প্রথমজনের আবিষ্কর্তা প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও দ্বিতীয়জনের আবিষ্কর্তা শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন। বসু মহাশয় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্পর্কে এত উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে, বহু পরিশ্রমে কুলজী গ্রন্থ ঘেঁটে এই বিস্মৃতনামা কবির পরিচয় উদ্ধারের দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। অথচ বিব্রত হয়ে পড়লেন যখন বিজয় পণ্ডিতের রচনার সঙ্গে পরাগলী মহাভারতের পাতায় পাতায় বিপুল সাদৃশ্য দেখতে পেলেন দীনেশচন্দ্র এই মিল বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও সম্পূর্ণ রহস্যের কিনারা করলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরাগলী মহাভারতের ভণিতা অংশ উদ্ধার করে দেখালেন যে, 'বিজয় পাণ্ডব কথা' বাক্যাংশটি লিপিকর প্রমাদে 'বিজয় পণ্ডিত কথা'-য় পরিণত হয়েছে।

বিজয় পণ্ডিতের অস্তিত্বগত সংকট এত সহজে সমাধান করা গেলেও সঞ্জয়ের ব্যাপারে কিছু ধোঁয়াশা এখনও রয়ে গেছে। এর আবিষ্কর্তা দীনেশচন্দ্র সেনের দাবি ছিল সঞ্জয়ই বাংলা ভাষায় আদি মহাভারত অনুবাদক। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নাকি তাঁর রচনাকেই আত্মসাৎ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সঞ্জয়ের পুথিতে একস্থানে আছে 'সঞ্জয়ে পয়ারে কথা গহিল যেন মত। হেন মতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত ॥' এই কথার উপরে ভিত্তি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এর সম্পাদক মুণীন্দ্রকুমার ঘোষও সঞ্জয়কেই মহাভারতের আদি অনুবাদক বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জয়ের নামে প্রচলিত পুথি আর পরগলী মহাভারতের পাঠ তুলনা করলেই বোঝা যায় কবীন্দ্রের রচনাটিই অল্পস্বল্প পরিবর্তনসহ সঞ্জয়ের নামে চলে গিয়েছে। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় সঞ্জয়ের ভণিতাগুলি বিচার করে বলেন যে, গ্রন্থের উপাদেয়তা ও উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্যে কোন গায়ক বা সংকলক দ্ব্যর্থবোধক 'সঞ্জয়' নাম ব্যবহার করেছিলেন। দু' একটি ভণিতা এইরকম মিলেছে—'সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়' কিংবা 'সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা'। দীনেশচন্দ্র ও মুনীন্দ্র কুমারের মতে, এই ভণিতাই নাকি প্রমাণ করে সঞ্জয় নামে পৃথক কবির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা ঐ ভণিতা থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাচ্ছেন। তাঁরা বলেন, 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এ যে-ভণিতা ব্যবহার করা হয়েছে তা আদৌ সংশয়মুক্ত নয়। মূল লেখক যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি মহাভারতের পৌরাণিক 'সঞ্জয়' চরিত্রের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন। আবার কারো কারো মতে, পূর্ববঙ্গের ভারত-পাঁচালি রচয়িতাদের কাব্যপ্রবাহে মিলিত হয়ে তথাকথিত সঞ্জয়-মহাভারতের সৃষ্টি করেছে। এই হিসাবে 'সঞ্জয়' একটি যৌথ নাম। অন্যদিকে অনুবাদটিতেসঞ্জয় তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় দাখিল করতে গিয়ে বলেছেন—'ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জনম। সঞ্জয়ের ভারতকথা কহিলেক মর্ম ॥' এবং 'দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কুমার। সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালী প্রকার ॥' এর থেকে দু' একজন গবেষক মনে করেন যে, এই কবি বিজয় পণ্ডিতের মতো একেবারে কাল্পনিক কোন চরিত্র ছিলেন না। তাছাড়া সঞ্জয়ের নামে যে-মহাভারত পাওয়া গেছে তা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের তুলনায় আকারে বড় এবং ভাষাও তুলনামূলকভাবে আধুনিক। খুব সম্ভবত কোন গায়েন পরাগলী মহাভারতকে সামনে রেখে তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু অংশ যোজনা করে গানের উদ্দেশ্যে এ মহাভারত রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—"সঞ্জয়" কোন কবির নামও নয়। হরিনারায়ণদেব নামে জনৈক ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ মহাভারতের অন্যতম চরিত্র 'সঞ্জয়' - এর নামের আড়ালে নিজেকে গোপন করে এই পাঁচালী গান করতেন।" অতএব সঞ্জয় নামের আড়ালে আলাদা কোন রচনাকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে এর রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'চার কথা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

সঞ্জয়ের মহাভারত আয়তনে বাকি দুটি মহাভারতের তুলনায় বড়। কাব্যটিতে মূল মহাভারতকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের চেষ্টা আছে। তবে রচনাচাতুর্যে সঞ্জয়ের লেখা উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে না। তবে বিষয়ের অভিনবত্ব দেখা যায় দ্রোণপর্বের পুথির অন্তর্গত 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' শীর্ষক রচনায়। মহাভারত বহির্ভূত এই উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হলে দ্রৌপদী, সত্যভামা, রুক্মিনী, জাম্ববতী, সুভদ্রা, রেবতী প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় অন্তঃপুরিকারা অভিমন্যু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রণক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলেন—এই রকম একটি কল্পিত কাহিনী গৃহীত হয়েছে 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ'-এ। এতে পাণ্ডবপক্ষীয়দের হাতে কৌরবরা যথেষ্ট নাকাল হয়। অবশ্য পালাটির শেষে ভণিতা দেওয়া হয়েছে রামকৃষ্ম দাসের। ইনি লিপিকর না পাঁচালী গায়ক তা এখনও অনির্ণীত ॥

৫.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় যে বিষয়ে আলোচনা করুন।

২। রামায়ণ অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের প্রদত্ত আত্মপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। কৃত্তিবাসের কাহিনী গ্রন্থনে মৌলিকতা বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৪। কৃত্তিবাসের রচনায় রামভক্তিবাদের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালি জীবন কতটা উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে উদাহরণ যোগে আলোচনা করুন।

৬। ভাগবত অনুবাদক মালাধর বসুর ব্যক্তি-পরিচয় ও আবির্ভাবকাল বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৭। অনুবাদে মালাধরের কৃতিত্ব পরিমাপ করুন।

৮। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের ছাপ কতটা ফুটে উঠেছে এ বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৯। প্রথম পর্বের মহাভারত অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা সম্ভবন্ধে আলোকপাত করুন।

২। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল বিষয়ে সংক্ষেপে আপনার অভিমত দিন।

৩। বাংলা অনুবাদে কৃত্তিবাস চরিত্র সৃষ্টিতে যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তার পরিচয় দিন।

৪। হাস্যরস ও করুণরস সৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের দক্ষতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। কৃত্তিবাসের ব্যবহৃত অলংকারগুলির বিশিষ্টতা কোথায় তা বুঝিয়ে দিন।

৬। শ্রীচৈতন্যদেব মালাধরের কাব্যের প্রতি কেন আসক্ত ছিলেন তা আলোচনা করুন।

৭। অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর ভাগবতকে কতটা অনুসরণ করেছে তা বিভিন্ন কাহিনী উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

৮। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত ‘পাণ্ডব বিজয়’ কে ‘পরাগলী মহাভারত’ বলার কারণ কি? কাব্যটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৯। শ্রীকর নন্দীর অনুবাদের বিশিষ্টতা কোথায় তা দেখিয়ে দিন।

১০। বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয়ের মহাভারত অনুবাদ সম্ভবন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

বস্তুমুখী প্রশ্ন :

১। অনুবাদের মুখ্য কারণটি কি ছিল?

২। বাংলায় অনূদিত ধর্মাশ্রিত কাব্যে দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী কী?

৩। 'কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলংকার'—এটি কার কথা?

৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম কোথায় ছাপা হয়?

৫। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান কোথায়?

৬। বাল্মীকি ছাড়া কৃত্তিবাসের অন্য একটি আদর্শের নাম বলুন।

৭। বিভীষণের পুত্রের নাম কী?

৮। 'হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোনরে ব্যাটা গরু'—উক্তিটি কার?

৯। তুলসীদাস রচিত গ্রন্থটির নাম কি?

১০। ভাগবতে মোট কত স্কন্ধ ও অধ্যায় আছে?

১১। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্য নামগুলি কী কী?

১২। শ্রীচৈতন্যের কাছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন্ ছত্রটি প্রিয় ছিল?

১৩। 'পঞ্চম বেদ' কোনটি?

১৪। কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার রাজসভায় আবিভূত হন?

১৫। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কোন্ পর্বটিকে আশ্রয় করেছিলেন?

১৬। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের আবিষ্কর্তা কে?

১৭। সঞ্জয়ের কাব্যের প্রধান সমর্থক কে?

১৮। 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' অংশটি কার রচনায় আছে?

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৯১

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫

৩. ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮

৪. শ্রীমন্তকুমার জানা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৯৪

৫. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, ১৯৮৮

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.